বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র, এম.এ.
শ্রীসুকুমার সেন, এম.এ., পি-এইচ.ডি.
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম.এ.
শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম.এ.
সম্পাদিত

দ্বাদশ সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯০

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

(১) সূচনা

জগৎকে বাদ দিয়া কাব্য হয় না। কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্যের জগৎ এত রূপান্তরিত যে, সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা এক অপরিচিত রহস্যলোক। ইহার মূলে রহিয়াছে কবির ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবাদর্শ। এ কাব্যের স্বরূপ বুঝিতে কবিস্বরূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠক জানেন যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববিশেষেরই রসরূপ। এই কারণে ইহা ঠিক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। এই জাতীয় তত্ত্বকেন্দ্রিক কাব্যের আবেদন পরিচিত হৃদয়াবেগের পথে পাঠকমনে আসে না; চিদ্‌বৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তি এখানে সমভাবে সক্রিয়।

পদাবলীকাব্যও বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য; সুতরাং সেই পাঠকেরই পক্ষে ইহার পরিপূর্ণ আস্বাদন সম্ভব, যাঁহার বৈষ্ণবতত্ত্বের সহিত পরিচয় আছে। তবু আধুনিক গীতিকাব্যের সহিত ইহার পার্থক্য গুরুতর। প্রথমতঃ, আধুনিক গীতিকাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হয় ব্যক্তিগতভাবে কবিকে; কিন্তু পদাবলীকাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হয় সমষ্টিগত ভাবে বৈষ্ণবকে। প্রথমটিতে কবির 'অহং'-ই বড়ো কথা; দ্বিতীয়টিতে একটিমাত্র ব্যাপক ধর্মাদর্শে কবির 'অহং' সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে যে মানসবৃত্তিগুলি অবিরাম অনুশীলিত হইতেছে, তাহাদেরই উদ্বোধনপন্থায় পদাবলীকাব্য পাঠকের হৃদয় সহজেই আন্দোলিত করিয়া তুলে। এই কারণে রসাস্বাদও সহজ হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—নির্বিকল্প আনন্দই যদি কাব্যের ফল হয়, তবে তত্ত্বভূমিকা বাদ দিলেও তো পদাবলীর আস্বাদন ব্যাহত হইবে না; সুতরাং বৈষ্ণবতত্ত্ব জানার কি আবশ্যকতা? ইহার উত্তর এই যে, তত্ত্বের সঙ্গতিসূত্রে পদাবলীর আস্বাদনে আনন্দের আকার এক থাকিলেও প্রকার পৃথক হয়। সাধারণ রতির স্থানে 'কৃষ্ণরতি'-কে স্থায়িভাবরূপে গ্রহণ করায় যে একটি মানসপরিমণ্ডল গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি একপ্রকার নূতন রূপ লইয়া আসায় তাহাদের সংযোগে নিষ্পন্ন আনন্দ হয় ভক্তিরস—Tune এক থাকিলেও tone বদলায় (যাঁহারা বেহালায় ও সেতারে একই রাগের একই ভাবের আলাপ শুনিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই একথার তাৎপর্য্য বুঝিবেন)।

'পদাবলী' শব্দের উৎস জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী'। পদসমুচ্চয় অর্থে 'পদাবলী'র প্রয়োগ করিয়াছিলেন সপ্তম শতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডী—"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী" (কাব্যাদর্শ ১।১০)। বাঙলার বৈষ্ণব সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পদাবলীকে যোগরূঢ়ভাবে গানের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া আসিতেছেন। এখন আবার শাক্তগানও 'পদাবলী' হইয়াছে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলী-রচয়িতা তিন জন জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। ইহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বহুবিচিত্র লীলার একটিমাত্র অংশ—বসন্ত-রাস—রূপায়িত হইয়াছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'। গীতগোবিন্দ নাটকীয় ভঙ্গীময় একখানি সম্পূর্ণ গীতিকাব্য। জয়দেব অসাধারণ বাক্‌শিল্পী। তাঁহার সৃষ্টির সার্থক অনুকরণ আজ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সংস্কৃতে রচিত হইলেও তাঁহার গানগুলির ভাষা যেন সংস্কৃত ও বাঙলার মধ্যপন্থায় দাঁড়াইয়া বাঙলারই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু ও ভাবধারা এক দিকে যেমন চৈতন্যধর্ম্মকে প্রভাবিত করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি ভাষা ও ছন্দের সহযোগে উত্তরকালের গীতিধর্ম্মী বাঙলা সাহিত্যকেও প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। বহিরঙ্গরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী,' এমন কি পদচয়নেও অনেক স্থলে রবিকবি জয়দেবকবির নিকট ঋণী—'সাগরিকা'র 'ললিতগীতিকলিতকল্লোলে' 'কলিতললিতবনমাল'কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। জয়দেবহীন পদাবলী-সাহিত্য অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা গীতগোবিন্দ হইতে একখানি গান আমাদের চয়নগ্রন্থে মাঙ্গলিকী-রূপে উদ্ধৃত করিলাম।

জয়দেব হইতে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি—দীর্ঘ তিন শতাব্দীর ব্যবধান। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বাঙালী রচিত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা ও একখানি মাত্র সুসংবদ্ধ সংস্কৃত কাব্য ছাড়া অন্য কোনও পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য সংস্কৃতে বা বাঙলায় আজও এদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত কাব্যখানির নাম 'রাধাপ্রেমামৃত'। প্রাসঙ্গিক বলিয়াই ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। প্রথমে দুই শ্লোকে রচিত একটি মঙ্গলাচরণ। শ্লোকদুইটি কবির স্বকৃত নহে। প্রথমটি গীতাপাঠের পূর্ব্বে পঠিতব্য প্রসিদ্ধ নমস্কারশ্লোক "যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র………" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১২।১৩।১) এবং দ্বিতীয়টি ভাগবত-দশমের শেষ অধ্যায়বর্ত্তী প্রসিদ্ধ "জয়তি জননিবাসঃ……"। ইহার পর চারিটি 'খণ্ড'—'বস্ত্রাপহরণখণ্ডঃ', 'ভারখণ্ডঃ', 'নৌকাখণ্ডঃ' ও 'দানখণ্ড'। বহুস্থলেই উৎকৃষ্ট কাব্য রহিয়াছে ; কবি শক্তিমান্। ইহার নাম যে কি, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। প্রাচীনত্বের প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান। ইনি সনাতন গোস্বামীরচিত—'বৈষ্ণবতোষণী'র "চণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদি"র চণ্ডীদাসও হইতে পারেন, আবার 'আদি'-দেরও কেহ হইতে পারেন। 'বড়ু'-র বাঙলা 'খণ্ড' সংস্কৃত টীকাকার ও আজীবন সংস্কৃতলেখক সনাতনের লক্ষ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

জয়দেবের পূর্ব্বেও বাঙলাদেশে সংস্কৃতে বা অপভ্রংশে রচিত পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য ছিল বলিয়াই বিশ্বাস হয়। 'রাগাত্মিকা' শব্দটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হইলেও, ভাবটি প্রাচীন। এই ভাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈষ্ণবী ধারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের লীলাপরিবেশ ও লীলাবৈশিষ্ট্য অপরিচয়হেতু বাঙালীর সানন্দ আপ্যায়ন লাভ করিত না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু: তাহার স্বরূপ"

যে উৎস হইতে উৎসারিত, সেখানে 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' সহিত গীতগোবিন্দও বর্ত্তমান—

কর্ণামৃতে তাহা প্রকাশমান, গীতগোবিন্দে ইঙ্গিতময় ; কর্ণামৃত শুধু 'অঙ্গীকৃতনরাকার' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে ; গীতগোবিন্দ কৃষ্ণের মুখের কথায় এবং কার্যাকলাপে তাঁহার মানবরূপকেই মহিমোজ্জলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাগাত্মিকা ভক্তির বশীভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আপন মস্তকে মানাশ্রিত ভক্তের চরণ-প্রার্থনা, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" জয়দেবের সমকালীন বাঙালী বৈষ্ণবকে বিদ্রোহী করে নাই, চমৎকৃত করিয়াছে ; কারণ ভক্ত ও ভগবানের প্রেমসম্পর্কের এই পরাকাষ্ঠা তাহার ভাবকল্পনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাগ্ জয়দেবযুগের এবং জয়দেবোত্তর তিন শতাব্দীর বাঙলার বৈষ্ণব ঐতিহ্য স্পষ্টরূপে জানিবার কোনও উপায় আজও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান পূর্ণ নহে। গ্রিয়ার্সন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'মৈথিলপদসংগ্রহে' ('Chrestomathy') বিদ্যাপতির মাত্র ৭৬টি রাধাকৃষ্ণলীলা-পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উহার বেশী তিনি মিথিলায় পান নাই। তাঁহার সংগ্রহের ভিত্তি কোনও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নহে, অন্ধ ভিক্ষুকের মুখে শোনা এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজার গৃহে পাওয়া (শোনা ?—পাণ্ডুলিপির উল্লেখ তিনি করেন নাই) গান মাত্র। এই সংগ্রহের কিছু আমাদের অপরিচিত, কিছু সংখ্যাখচিত প্রহেলিকামাত্র। গানগুলির সবই যে বিদ্যাপতিরচিত তাহারও প্রমাণাভাব। যেমন শুনিয়াছেন তেমনি ছাপিয়েছেন, না, উহাদের উপর ভাষাতাত্ত্বিক অস্ত্রোপচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই। করিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্ষুকের মুখে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা না পাওয়াই স্বাভাবিক। ভাষাতাত্ত্বিক গ্রিয়ার্সন একথা ভালই জানিতেন ; সুতরাং উপযুক্ত অস্ত্রোপচার তিনি যে করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদের সংখ্যা প্রায় হাজার। এ সংখ্যাও অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট পদ বাঙালী পদকর্তা কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, কবিশেখর, কবিবল্লভ, ভূপতি প্রভৃতির রচিত ব্রজবুলিপদ। বিদ্যাপতি-ভণিতার বাঙলা পদগুলির রচয়িতা বাঙালী। বড়ু চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত তেরটি পালায় (শেষেরটির নাম 'রাধাবিরহ', বাকীগুলির প্রত্যেকটির উত্তরপদ 'খণ্ড') বিভক্ত রাধাকৃষ্ণগানের একখানি পুঁথি বাঁকুড়ার এক পল্লীতে পাইয়া শ্রদ্ধেয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ভূমিকা ও টীকাসহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। "পুঁথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুঁথির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কথিত হয়, চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'-কাব্য রচনা করেন।......অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামকরণ অসমীচীন নয়।" [ভূমিকা।] ভাষাতাত্ত্বিকের মতে ইহার ভাষা চৈতন্য-পূর্ব্ব ; সুতরাং বড়ু প্রাক্‌চৈতন্যযুগের। পূর্ব্বের ভূমিকায় বসন্তরঞ্জন লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের 'বাসুলী' বজ্রযানী বৌদ্ধদের বজ্রেশ্বরী ("বজ্রেশ্বরী-বজ্ জসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলী")। "বাসুলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ-দেবতা"। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের নূতন সংস্করণের 'পুনর্লিখিত' ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন : "কবির দেশ বীরভূম নানুর। চণ্ডীদাস বাসলীর বাগীশ্বরীর বরে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা গান করেন। ......নানুরের বাসলী ধর্ম্মপূজাবিধানের

বাসলী - - - নহেন। ইনি পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী প্রতিমা। - - - ভাস্কর্য্য খ্রীষ্টীয় ৮।৯ম শতাব্দীর অনুরূপ।

"বাসলী বাগীশ্বরী শব্দেরই রূপান্তর [বাগীশ্বরী বাইসরী বাসরী বাসলী]।...সরস্বতী ও বাসলী এক ও অভিন্ন। ইঁহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়।" চণ্ডীদাসকে বীরভূমের নান্নুরে আনায় বাঙলায় চিরপ্রচলিত কিংবদন্তীর সম্মান রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু নূতন সমস্যারও উদ্ভব হইল; আমরা আনন্দিতও হইলাম, চিন্তিতও হইলাম। বাঁকুড়া জেলার ছাতনার চণ্ডীদাস-দাবী, এক পুরাতন স্মৃতি আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিতেছে: রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'-গ্রন্থে দেখা যাইতেছে যে, ছাতনা তখন ঠিক এইভাবেই বিদ্যাপতিকেও দাবী করিয়াছিল।

মহাপ্রভুর সমকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পদাবলী-সাহিত্যের যে কূলপ্লাবী মহাধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তিনটি ধারায় যুক্ত ত্রিবেণী—রাধাকৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গলীলা। পারিষদের চক্ষে, ভক্তের চক্ষে শচীনন্দন গৌরচন্দ্র 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' হইলেও, পদকর্তাদিগকে সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন রাধাভাবাক্রান্ত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের মূর্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হয় ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে। নবদ্বীপে তরুণ নিমাই পণ্ডিত গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে গিয়া পরম বৈষ্ণব ঈশ্বর পুরীর নিকট প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন। নদীয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর লোকে সবিস্ময়ে দেখিল উদ্ধত পণ্ডিত-নিমাই ললিত প্রেমিক-নিমাইয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। ভাবাবেশে বিহ্বল নিমাইয়ের অলৌকিক আচরণে অদ্বৈত-শ্রীবাসপ্রমুখ প্রাচীন আচার্য্যগণ মুগ্ধ হইয়া ভক্তশিষ্যরূপে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। অচিরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন নিমাইয়ের গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য অবধূত নিত্যানন্দ। হরিনামরসে "শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে' ভেসে যায়"—জনগনমনে সে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা। শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার অঙ্গনে চলিতে লাগিল উদ্দণ্ড কীর্তননৃত্য; অনধিকারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। জনগণ শুনিল, যে নাম সেই কৃষ্ণ—নামের সহিত সদা ফিরেন শ্রীহরি'। শ্রীহরি ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নহেন, মাধুর্য্যময় সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি মানবকিশোর কৃষ্ণ। মানুষের তিনি সখা, মানুষের তিনি সন্তান, মানুষের তিনি কান্ত। প্রতি মানুষের হৃদয়দ্বারে প্রেমের কাঙালরূপে তিনি নিত্য দণ্ডায়মান; দ্বার খুলিলেই মিলন ঘটিবে। মানুষে মানুষে ভেদ নাই; ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র কৃত্রিম পরিচয়। মানুষের একমাত্র সত্য পরিচয় সে মানুষ। মানবতা তখনই সার্থক হয়, যখন তাহার মধ্যে অনুস্যূত হয় ভগবৎপ্রেম। ভগবান্‌কে ভালবাসা সহজ; তাহা তত্ত্বজটিল কৃচ্ছ্রসাধনের "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথঃ" নহে। প্রতিদিনের সংসার-যাত্রায় আমাদের প্রীতি মাতায়-সন্তানে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, পতি-পত্নীতে যে বিচিত্রভাবে আপনা হইতে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে, তাহারই ভগবদ্মুখিতাই ভগবৎ-প্রেম।

নিরভিমান মহাপণ্ডিত, সর্ব্বত্যাগী, অনিন্দ্যসুন্দর একটি তরুণ মানবসন্তান একদিকে

দুই বাহু প্রসারিত করিয়া পরম প্রেমে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবমাত্রকেই আপন বক্ষে টানিয়া লইতেছেন, অপর দিকে অখণ্ড ভগবৎপ্রেমে সাশ্রুনেত্রে রোমাঞ্চিতদেহে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন—মানুষের অন্তর্লোকে আলোড়ন তুলিতে ইহাই যথেষ্ট। এই চিত্র বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হইয়াছে আমাদের পদাবলীতে—গৌরচন্দ্রিকায় তথা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গানে। চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা অনেকাংশে গোরাভাবে ভাবিত, প্রেমিক গৌরচন্দ্রের নারী-প্রতিরূপ।

(২) গৌরচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রিকা

বাঙলা সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যরূপ লাভ করে বৈষ্ণবযুগে। বৈষ্ণব কবির তিন শতাব্দী-ব্যাপী নিরবচ্ছেদ সাধনায় ইহার পরিপুষ্টি ও পরিণতি। আধুনিক কালেও ইহাদের প্রভাব গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারণেই ভাবী কালেও এ প্রভাব হইতে বাঙলার কবি মুক্ত থাকিতে পারিবেন না। অথচ এই বিরাট্ সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে একটিমাত্র মহাপুরুষের অলৌকিক জীবন—ইনি গৌরচন্দ্র। এই কারণে ইহার বহুমুখ দানের আলোচনা এখানে অপরিহার্য্য।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবদ্বীপে অদ্বৈত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, গঙ্গাদাস, গোপীনাথ প্রভৃতি বহু আচার্য্য বৈষ্ণব ছিলেন। নামকীর্ত্তনও অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক সঙ্কীর্ত্তনের পথে বহু বাধা ছিল। এই সকল বাধার অন্যতম হিন্দু অবিশ্বাসীর দল—"সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে।" তবু মহাপ্রভুর জন্মরাত্রিতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ-উপলক্ষে "হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়"। শ্রীবাস রাত্রিতে আপন গৃহে নামগান করিতেন বলিয়া পাষণ্ডীরা বলিত,

> "এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
> ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিয়া স্রোতে॥" —চৈতন্যভাগবত

'অবিশ্বাসী' অর্থে 'পাষণ্ড' শব্দের প্রয়োগ সম্রাট্ অশোক করিয়াছেন তাঁহার এক শিলা-লিপিতে। পরে এই 'পাষণ্ডী' বাধার সহিত যুক্ত হয় আর-এক কঠিন ও কঠোর বাধা—কাজী। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহাপ্রভু যে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন, তাহা ঠিক নগরকীর্ত্তন নহে—

> "দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
> কীর্ত্তন করহ সভে"—চৈতন্যভাগবত

ইহাই মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ'-সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোৎসাহে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কিন্তু একদিন

> "যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
> ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥"—চৈতন্যভাগবত

ইনি চাঁদ কাজী—নদীয়ার শাসনকর্ত্তা, গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের গুরু। কাজীর সহায় ছিল পাষণ্ডীরা—

> "কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বারবার।
> এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥

গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥"—চরিতামৃত

এই বিপদ্ হইতে নবদ্বীপকে মহাপ্রভু কেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ চৈতন্যভাগবতে (মধ্যম খণ্ড, ২৩) ও চৈতন্যচরিতামৃতে (আদিলীলা, ১৭) রহিয়াছে।

"মোর বংশে যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক্ দিব কীর্ত্তন না বাধিবে ॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

মহাপ্রভুর নিকট কাজীর এই শপথ গ্রহণের পর

"মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্ত্তন
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ ॥"—চৈতন্যভাগবত

ইহার পর কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ' শান্তিপুরে কয়েকদিন অদ্বৈতগৃহে অবস্থিতি ও নীলাচল-যাত্রা। এ সময়ে তাঁহার বয়স পূর্ণ চব্বিশ।

নবদ্বীপে মহাপ্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই নামসূত্রেই মানুষে মানুষে যে গ্রন্থিবন্ধন হইয়াছিল, তদানীন্তন জাতীয় জীবনে বাঙ্গালীর সে এক অপূর্ব্ব প্রাপ্তি। "চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ"—সদ্বংশজাত সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণের মুখে ব্রাহ্মণের এই নূতন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচারে, মুষ্টিমেয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও, সাধারণ মানুষ আপনার এক নূতন রূপের সন্ধান পাইয়াছিল এবং জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই উদার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এত বড় অসাধ্য সাধন শুধু ব্যাখ্যান ও প্রচারণার দ্বারা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর কথা প্রণিধানযোগ্য :

"আপনা আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥"

গৌরচন্দ্রের মানবপ্রেম অতীব স্বাভাবিক, কারণ, তাঁহার ভগবান্ মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ। তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই, প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। অন্তরে সমুদিত তত্ত্বে তাঁহার দেহে, বাক্যে, আচরণে যে সুনিশ্চিত অভিব্যক্তি লাভ করিত, জনগণের নিকট তাহা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ অপেক্ষা মূল্যবান্ ছিল। বুদ্ধ বা ক্রাইস্ট গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মহাপুরুষদের জীবন সূত্র, শিষ্যগণ ঐ সূত্রেরই ভাষ্যকার। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে মহাপ্রভুর কোনও দান নাই, ভক্তগণই উহা গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই ভাবের কথার কোনও মূল্য নাই, যেমন মূল্য নাই—চৈতন্য পণ্ডিত ছিলেন না, ভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে তাঁহাকে পণ্ডিত বানাইয়াছেন ইত্যাকার কথার। মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে ছিল কোমল-কঠোরের সমন্বয়। প্রেমে মানুষকে তিনি যেমন মিলাইয়াছিলেন, তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির পরাভবের দ্বারা তাহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভয়হীন জীবনে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিলেন। এই

শক্তিসঞ্চারের মূল কথা 'আচণ্ডালে কীর্তনসঞ্চার'। এইজন্যই গৌরচন্দ্রের প্রথম পরিচয় "সঙ্কীর্তন ধর্মের নিদান"। আজও পশ্চিম-বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে গৌর-আবাহনে নগর-কীর্তনের আরম্ভ এবং "নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘরে"-তে সমাপ্তি। মধ্যবর্তী পদগুলিতে গৌরচন্দ্র হরি-রাধা-কৃষ্ণের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। এগুলিও আমাদের পদাবলী-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট রূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষায় ও ভাব-সম্পদে মূল্যবান্। কীর্তনসঞ্চারী প্রেমদাতা গৌরাঙ্গের বহু সুন্দর চিত্র এগুলিতে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহাদের উদ্ধার ও সাহিত্যিক স্বীকৃতি আবশ্যক।

গৌরচন্দ্র যে নগরকীর্তন, নামকীর্তন, বৃন্দাবনলীলাকীর্তন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কীর্তনেরই পুরোভাগে অধিষ্ঠান করিবেন, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। ভূমিকারূপী এই গৌরপদগুলিকে সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা বলাও অসঙ্গত নহে।

তথাপি গৌরচন্দ্রকে লইয়া রচিত পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নহে। সত্যকার গৌর-চন্দ্রিকার ক্ষেত্র বিশিষ্ট; সুতরাং অর্থ সেখানে যোগরূঢ়। পালাবদ্ধ রসকীর্ত্তনের ক্ষেত্রেই ইহার বিশেষ অধিকার। বিভিন্ন পদকর্ত্তার রচিত সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়া কীর্তনীয়াগণ বিভিন্ন রাগে ও তালে যে লীলাগান করেন, তাহারই নাম পালাবদ্ধ রসকীর্তন। এই জাতীয় কীর্তনের প্রারম্ভে পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয়, তাহাই প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকা।

ভক্তের চক্ষে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ গৌরচন্দ্র—বহিরঙ্গে তিনি রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দপ্রমুখ আচার্য্য বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এই চক্ষে দেখিয়াছিলেন। শচীমাতার দীক্ষাগুরু বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্য, শচীমাতার 'সই' মালিনীর স্বামী শ্রীবাস আচার্য্য, অসাধারণ পণ্ডিত প্রবীণ বাসুদেব সার্বভৌম-প্রমুখ মনীষিবৃন্দ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। ভক্তগণ কখনও তাঁহার মধ্যে দেখিতেন কৃষ্ণভাব, কখনও রাধাভাব:

> কচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্,
>
> কচিদ্ রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যার্তিরুদিতঃ।"—চৈতন্যচন্দ্রামৃত

কিন্তু আমাদের চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানতঃ অনুপ্রাণিত হইয়াছে গৌরচন্দ্রের রাধা-ভাবে রাগানুগা ভক্তির দ্বারা। তাঁহার মত অলৌকিক ভক্তের পক্ষে রাধাভাব সম্ভব; কিন্তু সাধক ভক্তসাধারণের জন্য তাঁহার উপদেশ গোপীভাব—সখীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা।

বৈষ্ণবধর্মে গৌরচন্দ্রের অপূর্ব্ব দান "উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রী"। এই রসরূপা ভক্তির কথাই এখন আলোচনা করি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে "তৎ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ, অন্তরতরং যৎ অয়ম্ আত্মা···আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত (১।৪।৮)।" এই প্রিয়তমকেই কান্তভাবে উপাসনা বা ভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলসূত্র।

মানুষের কামক্রোধ ইত্যাদি স্বভাবধর্ম। সীমা ছাড়াইয়া গেলেই ইহারা হয় রিপু। ইহাদের মধ্যে কাম আদি ও প্রবলতম। কাম ও প্রেম মূলে এক। দেহসম্ভোগ-বাসনার

উদ্দামতায় যাহা রিপু, সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা জীবনানুকূল বৃত্তি, দেহানুগ অথচ সূক্ষ্ম-সুন্দর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ সুকুমার-রূপে যাহা মানবীয় প্রেম, তাহাই দেহাতিক্রান্ত দিব্যপ্রীতিতে ভগবৎ-প্রেম। সকল সাধনারই গোড়ার কথা কাম-জয় ; কিন্তু জয় করিবার পথ বিভিন্ন। রাজযোগের ভূমিকা কামের অস্বীকৃতিরূপ ব্রহ্মচর্য্য। তন্ত্রযোগে কাম স্বীকৃত ; কিন্তু উপায়রূপে, উপেয়রূপে নহে অর্থাৎ সাধনরূপে, সাধ্যরূপে নহে। সহজিয়া ধর্ম্মের প্রকৃতি-ভজনে কাম স্বীকৃত ঐ সাধনরূপে। তান্ত্রিকের তথা সহজিয়ার সাধ্য বস্তু মুক্তি। কাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনাতে স্বীকৃত, কিন্তু দেহস্পর্শহীন নির্ম্মল ভাবমাত্রে রূপান্তরিত। পূর্ব্বোক্ত সাধনা দুইটি হইতে গৌড়ীয় সাধনার পার্থক্য এই যে, ইহাতে কামই সর্ব্বস্ব, একমাত্র সাধ্য বস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ। ভাববৃন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তারূপ ভক্তের বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগাত্মক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। প্রেম ও কৃষ্ণ এক। মুক্তিকে তাঁহারা ঘৃণা করেন—"ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম" (চরিতামৃত)। গৌতমীয় তন্ত্রে গোপীপ্রেমকে কামই বলা হইয়াছে—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্" এবং চরিতামৃতকার বলিয়াছেন :

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম-নাম ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই 'অপ্রাকৃত কাম' যাঁহাকে সমর্পণ করেন, সেই "রসো বৈ সঃ" শ্রীকৃষ্ণ "অপ্রাকৃত নবীন মদন"। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত যখন অন্তর্বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন, তখন দ্বৈতভাবের ক্ষণিক তিরোভাব ঘটে। ইহার আংশিক আভাস রহিয়াছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪।৩।২১ : প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ্য বা আন্তর কোনও ভেদজ্ঞান থাকে না, প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাত্মারও তেমনি বাহ্য বা আন্তর কোনও ভেদজ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি তেমনি আবার সর্ব্বকামনার শেষ ("যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্ ; এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্ ; তদ্ বা অস্য এতৎ আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্")। বলা বাহুল্য যে, জীবাত্মা এখানে 'প্রিয়া' অর্থাৎ কান্তারূপে কল্পিত এবং এ অবস্থায় ভেদজ্ঞান প্রিয়ারও থাকে না। ইহার উপলব্ধি গৌরচন্দ্রের ছিল বলিয়া তিনি রায় রামানন্দের প্রেমবিলাস বিবর্তের পদে রাধার উক্তি—

"না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভাব পেষল জানি ॥"

শুনিয়া স্বহস্তে রামানন্দের 'মুখ আচ্ছাদিল', কারণ, ইহাই প্রেমের শেষ সীমা—"সাধ্য-বস্তু-অবধি এই হয়" (চরিতামৃত)।

গৌরচন্দ্র ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাঁহার সুকুমার স্বর্ণকান্তি তনু রাধার কল্পিত তনুর অনুরূপ ছিল বলিয়া বহিরঙ্গে তাঁহাকে রাধারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহাকে "রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার, নিজরস আস্বাদিতে" অবতীর্ণ "রাধাভাবদ্যুতি-

স্ববলিত কৃষ্ণস্বরূপ" বলা হইলেও ইহার তাৎপর্য্য, বোধ করি, তাহার রাধাভাবে ভাবিত প্রেমসাধকেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'ভাবিত' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ 'বাসিত' ("ভাবনং বাসনম্…তদুক্তম্ অহো হি অনেন রসেন গন্ধেন বা সর্ব্বম্ এতৎ ভাবিতং বাসিতম্"—দশরূপক ৪।৩-ব্যাখ্যায় ধনিক)। রাধার রাগের আনুগত্যময়ী প্রেমসাধনায়, রাধার সহিত নিরবচ্ছিন্ন মানস সান্নিধ্যের ফলে গৌরচন্দ্র রাধার ভাবদ্যুতিতে সুবলিত, ভাবরসে রসায়িত হইয়াছিলেন। এ অবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মত। বৃন্দাবনলীলার রহস্যলোকে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। গ্রন্থ-রচনার দ্বারা নহে, সভায় সভায় বক্তৃতা করিয়া নহে, আপন জীবনে প্রকটিত করিয়া 'আপনি আচরি' তিনি 'স্বভক্তিশ্রী'র 'উন্নতোজ্জ্বলরস'-রূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ভাবের ভক্তি 'অনর্পিতচরী' ছিল—তাঁহার পূর্ব্বে ভক্তিধর্ম্মের কোন প্রবর্ত্তয়িতাই ভগবদ্ বিষয়িনী রতিকে এমন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চমপুরুষার্থ রূপ অদ্ভুত শৃঙ্গাররসে পরিণমিত করিতে পারেন নাই।

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য ? নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা ? কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ ?
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমাম্ ?
একশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥"

—প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। একখানি বাঙলা পদেও ইহার অনুরণন রহিয়াছে : গৌরাঙ্গ না হইলে ("গৌর নহিত")

রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে।
মধুরবৃন্দাবিপিনমাধুরীপ্রবেশচাতুরীসার।
বরজযুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥"—বাসু ঘোষ

রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাবস্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁহার ভক্তমণ্ডলী বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভের বিগ্রহ। তবু, পূর্ব্বরাগাদির প্রকাশ লক্ষিত হইলেও, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, তাহা বিরহবিপ্রলম্ভ। তাঁহার নীলাচল-জীবনের শেষ বারো বৎসর একপ্রকার বিরহদিব্যোন্মাদেই কাটিয়াছিল :

"শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর।
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে ॥"

—চরিতামৃত

'অন্ত্যলীলা'য় কৃষ্ণদাস এই দিব্যোন্মাদের অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিষদগণের অন্যতম ছিলেন সুধাকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক মুকুন্দ। মুকুন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল 'সময় উচিত' কীর্ত্তনগান। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

"প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গায়িতে ॥"

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'সময় উচিত', 'ভাবের সদৃশ' ও 'পদ'। কীর্তনগানকে 'পদ' বলা কৃষ্ণদাসের সময়ে নহে, তাঁহার পূর্ববর্তী প্রথম চরিতকার বৃন্দাবনদাসের সময়েও প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাস স্বরচিত গানসম্পর্কে বলিয়াছেন "যথা রাগঃ"; কিন্তু মহাজনের গান উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন "তথা হি পদম্"। বৃন্দাবনদাসও মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন, "শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্তন।" 'সময় উচিত' ও 'ভাবের সদৃশ' বলিতে বুঝায় গৌরচন্দ্র বিচিত্র প্রেমধারার যে বিশেষ রূপের দ্বারা আবিষ্ট হইতেন, তাহার অনুরূপ গোপীপ্রেমের পদ। ইহা গৌরচন্দ্রিকার বিপরীত; কারণ, এ সকল গৌরভাবের সদৃশ রাধাভাবের পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা রাধাভাবের সদৃশ গৌরভাবের পদ। অদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর যে বিরহার্ত রূপটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুন্দ 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি' ইত্যাদি পদ গাহিয়াছিলেন, সেই রূপটিই গৌরচন্দ্রিকা, কিন্তু অলিখিত অর্থাৎ ভাষায় আরোপিত নহে। ঐ রূপগুলিরই মধ্যে নিহিত ছিল গৌরসমকাল হইতে রচিত গৌরচন্দ্রিকার বীজ। উত্তরকালের 'পালাকীর্তন তখন না থাকিলেও একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, একই রসের পদসমষ্টি আমাদের অপরিচিত সুরে ও তালে গাহিবার প্রথা তখনও বর্তমান ছিল।

গৌরচন্দ্রের প্রেমবৈচিত্র্যের যাঁহারা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তাঁহাদের অনেকে—মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব-মাধব-গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি—তাঁহার ভাববিলাসের প্রতিটি রূপ নিপুণ তুলিকায় চিত্রায়িত করিয়াছেন। ঐ চিত্ররাজিকে আশ্রয় করিয়া উত্তর-কালের বহু মহাজন অজস্র পদ রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। উভয় ভাবেরই গৌরপদ রচিত হইয়াছে। তবু ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব উজ্জ্বল-রসরূপে—বৈকুণ্ঠের 'শ্রী' (লক্ষ্মী)-কে বৃন্দাবনের রাধারূপে—সমর্পণের উদ্দেশ্যেই ("সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসং স্বভক্তিশ্রিয়ম্"—রূপ গোস্বামী) তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া তাঁহার মধ্যে রাধাভাবই অধিকতর স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। এইভাবে কৃষ্ণ তাঁহার কান্ত। কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তা গৌরচন্দ্রের অনবচ্ছিন্ন মানস প্রেমলীলা। ভাবসিন্ধু কখনও স্তব্ধ, কখনও ঊর্মিচপল, কখনও তরঙ্গে-তরঙ্গে উদ্বেলিত। মূর্চ্ছায়, অশ্রুহাস্যে, দিব্যোন্মাদে তাঁহার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ধারা প্রাক্-চৈতন্যযুগের বহু পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশে বহমান থাকায়, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব বাঙালীর তাহা পরিচিতই ছিল। জয়দেব-চণ্ডীদাস একদিকে যেমন ঐ ধারারই রূপকার, অন্যদিকে তেমনি উহার শক্তিসঞ্চালক ও রসপোষ্টা। ইঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি—শৈব দেশের বাঙালী-হৃদয় বৈষ্ণবকবি। বাঙালী বৈষ্ণবের রসবোধ জাগ্রত ছিল বলিয়াই গৌরচন্দ্রের বহুবিচিত্র ভাবলীলার কোন্‌টিতে বৃন্দাবনলীলার কোন্ বিশেষ রূপটির ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—পূর্বরাগ ইত্যাদি পারিভাষিক নামগুলি তাঁহাদের পরিজ্ঞাত ছিল। তাহা না হইলে "ভাবের সদৃশ পদ" গান করা মুকুন্দের পক্ষে সম্ভব হইত না। সহজ কথায় গৌরলীলা বৃন্দাবনলীলার ভাব-প্রতিরূপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন ছন্দোবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে গৌরপদাবলীতে। এই সকল পদের নাম গৌরচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের অবতরণিকারূপে এই পদ কীর্তনের আসরে প্রথমেই গীত হয়। মর্মজ্ঞ

শ্রোতা এই গৌরচন্দ্রিকা শুনিবামাত্রই বুঝিতে পারেন বৃন্দাবনলীলার কোন্ পর্য্যায়টি বর্তমান আসরের বিষয়বস্তু।

"আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ।
করতলে বয়ান করই অবলম্ব॥
খনে খনে গতাগতি করু ঘরপন্থ।
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত॥"

—এই গৌরচন্দ্রিকায় শ্রোতার মানসনয়নে যে চিত্রখানি ফুটিয়া উঠে, তাহা পূর্ব্বরাগে ভাবাবিষ্টা রাধার চিন্তা-ঔৎসুক্য-উদ্বেগের চিত্র। রাধার পূর্ব্বরাগের ব্যঞ্জনাময়ী এই গৌরচন্দ্রিকার 'আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়া অবলীলাক্রমে প্রবেশ করেন বৃন্দাবনলীলায়:

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশাস সঘন
কদম্বকাননে চায়॥ ..."

হিরণ্যদ্যুতি কমনীয়তনু সন্ন্যাসীর পুণ্যজীবনের শুদ্ধ-প্রেমপূত লীলাকে এইভাবে ভূমিকারূপে উপস্থাপিত করিয়া গায়ক এমন একটি পরিমণ্ডল রচনা করেন, যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তির স্পর্শাতীত। শ্রোতার মন, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে, এক অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা লাভ করিয়া কামগন্ধহীন প্রেমলোকে মুক্তি পায়। এইখানেই কীর্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা।

কৃষ্ণভাব লইয়া রচিত গৌরপদও বহুসংখ্যক। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গৌরচন্দ্রিকারূপে গীত হয়। কিন্তু এই গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগক্ষেত্র এক দিকে যেমন ব্যাপক অন্য দিকে তেমনি সঙ্কুচিত। ব্যাপক এই অর্থে যে, প্রেমলীলার বহিঃক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষ্ণের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ইহারা প্রযুক্ত হয়। রস সেখানে বাৎসল্য, সখ্য ইত্যাদি। কৃষ্ণের নৃত্য-খেলা-ননীচুরি, পূর্ব্বগোষ্ঠ, কালিয়দমন, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতির গৌরচন্দ্রিকায় গৌরের কৃষ্ণভাব। আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত ভাবে বিশেষ বিশেষ পালাকীর্তনে, যেমন দানলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে, গৌরচন্দ্রিকা কৃষ্ণভাবের গৌরকে লইয়া পদ। বিপ্রলম্ভের বিশেষতঃ মাথুর বা বিরহের গৌরচন্দ্রিকায় মহাপ্রভুর মুখ্যতঃ রাধাভাব। কিন্তু গৌণভাবে কৃষ্ণভাবও ক্ষেত্রবিশেষে আরোপিত হয়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষের—

"হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও॥"

—পদখানিতে সন্ন্যাস লইয়া 'গোরাচান্দে'র নদীয়া-ত্যাগে নদীয়াবাসীর বেদনা কৃষ্ণের বৃন্দাবন-ত্যাগে ব্রজবাসীর বেদনার অনুরূপ। লক্ষণীয় যে, এই গৌরচন্দ্রিকাখানিতে

বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার নাই। তবু এই জাতীয় পদ "প্রবাসরসেন পূর্ব্বাপরং গেয়ম্"। গোবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসুঘোষের—

"হরি হরি গোরা কোথা গেল।···
ফুকারি কান্দিতে নারে চোরের রমণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরামুখখানি॥"—পদকল্পতরু (১৬৩৬)

মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা। এখানে 'গোরা' শুদ্ধ কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের মিলিতরূপ নহেন এবং ব্রজগোপীর ভূমিকায় 'নদীয়া-নাগরী'। আখর দিতে দিতে কীর্ত্তনীয়া আরম্ভ করিবেন রাধার বেদনাময়ী উক্তি—

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুলমাণিক কো হরি নেল॥"

রস এখানে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার, নায়ক গৌরকৃষ্ণ; কিন্তু নায়িকা 'নদীয়া-নাগরী'।

সকল গৌরপদই গৌরচন্দ্রিকা নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত গৌরপদ হইতে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। "পতিত হেরিয়া কাঁদে" ইত্যাদি পদে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা "বরণ-আশ্রম কিঙ্কন-অকিঙ্কন"-নির্ব্বিশেষে প্রেমবিতরণকারী পতিতপাবন গৌরচন্দ্রের। ইহা গৌরচন্দ্রিকা নহে। পরমানন্দের অপূর্ব্ব সুন্দর পদ "পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে···" র সম্বন্ধেও এই কথা।

(৩) বৈষ্ণবমতে রস

মানুষ এমন কতকগুলি মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহাদের ধ্বংস নাই। শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ-প্রভাব এগুলির প্রকাশকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে না। এই কারণেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্থায়ী বা চিরন্তন বলা হইয়াছে। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রমতে ইহাদের সংখ্যা আট—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। ইহারা আমাদের বাসনায় সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। উদ্বোধনের কারণ ঘটিলে ইহারা চেতনায় আবির্ভূত হয় এবং আমাদের দেহে বা আচরণে তাহার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী (সঞ্চারী) ভাবের সংযোগে এই স্থায়ী ভাব রস-পরিণতি লাভ করে। সুতরাং রসের সংখ্যাও আট এবং ইহাদের যথাক্রমিক নাম—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।

সাধারণ অলঙ্কারশাস্ত্রে 'রতি' স্থায়িভাবের আস্বাদনীয় বিপরিণাম শৃঙ্গার-রস; নায়ক ও নায়িকা সেখানে আলম্বন-বিভাব। বৈষ্ণব আলঙ্কারিক 'রতি'র অর্থ-সম্প্রসারণ করিয়া তাহার রসপরিণতি অন্যভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ-সম্প্রসারণ তাঁহারা জোর করিয়া করেন নাই; সাহিত্যদর্পণে ইহার বীজ রহিয়াছে; বিশ্বনাথের সংজ্ঞায় প্রিয়বস্তুর

প্রতি মানবমনের সহজ অনুরাগই 'রতি' ("রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্"—৩।১৮০)। বৈষ্ণবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তাঁহাদের রতি লৌকিক নহে, 'কৃষ্ণরতি'। এই রতির রসরূপ পাঁচটি হইলেও স্বরূপে রস একটিমাত্র—'ভক্তিরস'। রূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥" অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ী ভাব 'কৃষ্ণরতি' বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা ভক্তিরস হইয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি পাঁচ ভাবে হইতে পারে। এই পাঁচ প্রকার রতির পরিণতি পাঁচ প্রকার রসে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (শৃঙ্গার, উজ্জ্বল)।

(১) শান্তরস ঃ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী নিত্যবস্তুরূপে জানিয়া ভক্ত বিষয়বাসনা-বর্জনপূর্ব্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। এ অবস্থায় ভক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। ইহাতে স্থায়ী ভাব 'শম' নামে রতি। এই রতিতে 'সুতমিতরমনীসমাজে' 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' ক্ষণস্থায়ী। এই অনিত্যবস্তু হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ভক্ত সমর্পণ করেন নিত্য ভগবানে—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত নহি তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওয়ত সায়রলহরসমানা॥"

বিদ্যাপতির এই প্রার্থনাখানিতে রস 'শান্ত' হইলেও ইহাতে 'গৌড়ীয়'-বিরোধী মুক্তিকামনা আছে—'তারণ-ভার তুহারা'। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

(২) দাস্যরস ঃ ভগবান্ প্রভু, ভক্ত তাঁহার ভৃত্য; ভগবান্ ঐশ্বর্য্যশালী, ভক্ত দীন। ইহাতে স্থায়ীভাব 'সেবা' নামে রতি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যরূপই ভক্তমনকে আকর্ষণ করে এবং তাঁহার সেবা করিয়াই ভক্ত কৃতার্থ হইতে চাহেন। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা বর্ত্তমান, অধিকন্তু সেবা। সেবায় ভক্ত-ভগবানে ঈষৎ মমত্বসম্পর্ক জাগিয়া উঠে। মীরার 'চাকর রাখো জী' এই সূত্রে মনে পড়িয়া যায়। নরোত্তম দাসের "সেবা দিয়া কর অনুচর।…' 'তু মেরে হৃদয়কে রাজা" পদখানিতে দাস্যের ভাব রহিয়াছে।

শুদ্ধ শান্ত বা দাস্যরসের পদ চৈতন্যোত্তর যুগে নাই।

(৩) সখ্যরস ঃ ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে এখানে পারস্পরিক বিশ্বাসময় সমপ্রাণতার সম্পর্ক। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবাও ইহাতে বর্ত্তমান, অধিকন্তু সমপ্রাণতা। সেবা কিন্তু শুধু ভক্তই করেন না, ভগবান্‌ও ভক্তের সেবা করেন। ইহাতে স্থায়ীভাব "বিস্রম্ভ" * (সঙ্কোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস) নামে রতি।

"সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল ক'রে মুখ হ'তে ল'য়ে সভে দেয় কানুমুখে॥—বিশ্বম্ভর

* বৈষ্ণবশাস্ত্রে কোথাও কোথাও তালব্য 'শ'-এ 'র'-ফলা দেখা যায়। ইহা লিপিকার বা মুদ্রাকর-প্রমাদ। 'ধাতুপাঠ'-এ 'স্রম্ভ' ধাতুর অর্থ 'বিশ্বাস করা' এবং 'শ্রম্ভ' ধাতুর অর্থ প্রমাদ বা ভুল করা'। 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী'তে "বিশ্বাসে দন্ত্যাদিঃ তালব্যাদিঃ তু প্রমাদে"। এই কারণে 'বিস্রম্ভ' লেখা হইল।

"কানাই হারিল আজ বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে
বংশীবটতলে লৈয়া যায় ॥"—বলরামদাস

বলা বাহুল্য, সখ্যরসে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ভক্তমনে থাকে না।

(৪) বাৎসল্যরসঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের এখানে পাল্য-পালক সম্পর্ক—ভগবান সন্তান, ভক্ত মাতা (বা পিতা)। ইহাতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, অবিকল্প লালন-মমতাধিক্য বর্তমান। প্রয়োজন হইলে তাড়ন-ভৎসনাও লালনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে আসিয়া পড়ে। ইহাতে স্থায়ীভাব 'বৎসলতা' নামে রতি।

"বিপিনে গমন দেখি হ'য়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥
এচুখানি রাঙ্গাপায় ব্রহ্মা রাখুন তায়,
জানু-রক্ষা করুন দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥"—দ্বিজ মাধব

—মায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল-আশঙ্কায় নিরন্তর কম্পমান। মাতা যশোমতী যাঁহার 'প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া, রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতেছেন, তিনি সর্বমঙ্গলময় ভগবান্। কিন্তু এ জ্ঞান থাকিলে তো বৎসলতা সম্ভবপর হয় না। পদকর্তা মাতৃহৃদয়ের সহজ রূপটিই চিত্রায়িত করিয়াছেন।

(৫) মধুররসঃ ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কান্তা। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব এই পাঁচটির গভীর এবং আতিশয্যময় মিলনে মধুররস। ইহার স্থায়ীভাব 'মধুরা' নামে রতি।

শান্তে ভগবানকে ভালোবাসার প্রশ্নই উঠে না। ভালোবাসার সূচনা দাস্যে এবং সখ্য, বাৎসল্যের ভিতর দিয়া চরম পরিণতি মধুরে।

এই 'মধুরা' রতির তিনটি প্রকারভেদ—সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। 'সমর্থা' সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের রূপলাবণ্য-দর্শনে তাঁহার সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার ঐকান্তিক বাসনা হইতে যে-রতি ভক্তহৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাই 'সাধারণী'। কৃষ্ণের গুণাদি-শ্রবণে শাস্ত্রসম্মত পরিণয়বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গসুখলাভের বাসনা হইতে যে-রতি ভক্তহৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহার নাম 'সমঞ্জসা'। ভক্তহৃদয়ে যে কৃষ্ণরতি স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের (ভক্তের নিজের নহে) তৃপ্তিসাধনই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, যাহার কাছে সংসার-সমাজ সব মিথ্যা হইয়া যায়, যাহার প্রভাবে ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হন, তাহাই 'সমর্থা' রতি। মথুরায় কুব্জার রতি সাধারণী, দ্বারকায় রুক্মিণী-সত্যভামার রতি সমঞ্জসা। বৃন্দাবনে ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-শ্রীরাধার রতি সমর্থা—ইহারা কৃষ্ণের 'নিত্যপ্রিয়া'। এই নিত্যপ্রিয়াগণের শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী ও রাধা এবং এই দুইজনের মধ্যে উচ্চতর আসন রাধার।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, বৈষ্ণবীয় শৃঙ্গার-রসের বৃন্দাবনলীলায় স্থায়ী ভাব 'সমর্থা' নামে মধুরা রতি, নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী।

কিন্তু রাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গোবর্দ্ধনের পরিণীতা বলিয়া কৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া নায়িকা।

এ পরকীয়া লৌকিক পরকীয়া নহে। সম্পর্ক যেখানে ভক্তে ও ভগবানে, লৌকিকের প্রশ্নই সেখানে উঠে না।

সমর্থা রতির মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত রহিয়াছে। যে-প্রেমের পথে বাধা নাই, সে-প্রেমে তীব্রতা নাই। স্বকীয়ার প্রেম বৈচিত্র্যহীন। সমর্থা রতি 'সান্দ্রতমা' (নিবিড়তমা), 'সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা' অর্থাৎ 'কুলধর্ম্মধৈর্য্যলোকলজ্জাদি' সব কিছুকে বিস্মরণীয় অতলে ডুবাইয়া অর্থহীন করিয়া তোলাই ইহার স্বভাব। কোনও ভাবান্তরের দ্বারা ইহার লেশমাত্র রূপান্তর হয় না। স্বকীয়ার এই রতি সম্ভবপর নহে।

"গুরু-গরবিতমাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যামপরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার।
নয়নের ধারা মম বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাই আগুনি॥"

যে-রতিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, অথবা চণ্ডীদাসের—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥"

যে-রতিকে দিব্যোন্মাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করিয়াছে, তাহা পরকীয়া রাধার সমর্থা রতি।

বৈষ্ণবের এই পরকীয়াবাদ যে-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দার্শনিক। রাধাকৃষ্ণ লৌকিক নারী-পুরুষ নহেন। শৃঙ্গার-রসে পরকীয়া নায়িকা, আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেরও অনুমোদিত নহে ("ন অন্যোঢ়া"—দশরূপক; "পরোঢ়াং বর্জয়িত্বা"—সাহিত্যদর্পণ। ঊঢ়া বিবাহিতা)। লৌকিক অলঙ্কারশাস্ত্রের এই অননুমোদন ব্রজগোপীপক্ষে কেন প্রযোজ্য নহে, তাহাই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ নরাকার ভগবান্। সৎ-এর শক্তি 'সন্ধিনী', চিৎ-এর 'সম্বিৎ' এবং আনন্দের 'হ্লাদিনী'। ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধা সকলেই হ্লাদিনীর মানবী রূপ। হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতম প্রকাশ রাধিকা। সংক্ষেপে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায় আস্বাদন (নিজের রচিত কবিতা কবি যেমন আস্বাদন করেন, কতকটা সেইরূপ—তুলনাটি দুর্ব্বল, অনির্ব্বচনীয়কে বচনে বুঝাইবার প্রয়াস বলিয়া; ইহার ব্যঞ্জনাটুকুমাত্র লইতে হইবে)। লৌকিক সম্পর্কগুলি মায়িক—শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বিৎ শক্তির অন্যতম বিকার 'যোগমায়ার সৃষ্টি'। তত্ত্বের দিক হইতে রাধা কৃষ্ণের স্বশক্তিরই

অভিব্যক্তি বলিয়া স্বকীয়া এবং লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ মায়িকভাবে আয়ানবধূ রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া। জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের সহস্রবন্ধনে বাঁধা বলিয়া জগতের স্বকীয়, ভগবানের পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হইলে জীবকে সংসারবন্ধন তুচ্ছ করিয়া বাহির হইতে হয়; ইহাই পরকীয়ার অভিসার। বৈষ্ণব দর্শনের মতে জীবমাত্রেই নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণের আনন্দশক্তির অংশ; কিন্তু মায়া-প্রভাবে আপন স্বরূপ-সম্বন্ধে অচেতন। সাধনার দ্বারা চেতনার জাগরণ সম্ভব বলিয়া প্রত্যেকের মধ্যে আংশিক গোপী সম্ভাব্যতা বর্তমান।

রাধার ও ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের সাধ্যভক্তি। জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনাসাপেক্ষ বলিয়া তাহা সাধনভক্তি। সাধনভক্তির প্রথম স্তরপরম্পরা বৈধী অর্থাৎ শাস্ত্রবিধান-অনুযায়ী শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন (কৃষ্ণের পদসেবা নহে, তীর্থাদি যাত্রা), অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ("শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"—ভাগবত ৭।৫।১৮)। এই ভাবের সাধনায় চিত্ত পরিমার্জিত ও নির্ম্মল হইলে সেখানে প্রেমের প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রেমোদয়েই কান্তভাবের সূচনা। ইহার পর হইতে গোপীর অনুগত পন্থায় চলে কান্তভাবের সাধনা।

স্বত-উৎসারিত প্রেমে সহজচ্ছন্দে কৃষ্ণভজনের জন্য গোপীর ভক্তি রাগাত্মিকা। গোপীর এই 'রাগ' জন্মসিদ্ধ, সাধনলব্ধ নহে: "শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা" (চণ্ডীদাস)। যে প্রেমে ভক্তহৃদয়ে পরম দুঃখ ও সুখরূপে ব্যঞ্জনা লাভ করে, সেই পরিণত প্রেমের নাম রাগ। চণ্ডীদাসের রাধার।

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥"

—এই রাগের নিদর্শন। এই রাগ গোপীর কৃষ্ণভক্তির অন্তরাত্মা বলিয়া তাহার ভক্তি রাগাত্মিকা। জীবের রাগ স্বভাবজ নহে, সাধনলব্ধ। গোপী তাহার আদর্শ। জীবের সাধনা চলে গোপীর প্রেম-ভক্তির বা রাগের অনুসরণ-পন্থায়। গোপী গুরু, জীব শিষ্য। গোপী সিদ্ধ, জীব তাঁহার অনুগত সাধক—সুকঠিন মানসতপশ্চারী। এই কারণে জীবের ভক্তি রাগানুগা। নরোত্তম দাসের

"দুই মুখ নিরখিব দুই অঙ্গ পরশিব
সেবা করিব দোঁহাকার॥
ললিতা-বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানাফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর-তাম্বূল ভরি
যোগাইব অধরযুগলে॥"

—রাগানুগা ভক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী; তাঁহার মত লোকোত্তর ভক্তের পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধারণের ভজনা প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের;

রাধাভাবের নহে, যদিও রাধা গোপীগণেরই অন্যতমা। গোপীভাবে ভজনার অর্থ শ্রীরাধার সখী ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির আনুগত্যময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবারূপা।

স্থূল বিচারে মধুর রসে নায়িকা ব্রজগোপীমাত্রেই ; কারণ, এ রসের আলম্বনবিভাব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীবৃন্দ এবং প্রেয়সী ললিতা-বিশাখা-রাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনা। তবু, নায়িকা রাধা, যেহেতু তিনি হ্লাদিনীর সারভূতা, সর্ব্বগুণসম্পন্না, 'মাদন'-নামক ভাবের এক মাত্র অধিকারিণী মহাভাবময়ী। চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা, রাধার প্রায় সমগুণশালিনী বলিয়া। অন্য গোপীগণ কৃষ্ণপ্রিয়া হইয়াও লীলাবিস্তারিকা সখীর অপূর্ব্ব পদবী লাভ করিয়া আছেন।

অন্য ভাবের বিচারে বলিতে হয় যে, নিখিল ভক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতীক এবং মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধা। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখী 'আরাধিকা' রাধিকার ভক্তিমুখী বিচিত্র চিত্তবৃত্তিরই মূর্তিমান্ বিগ্রহ, শ্রীরাধারই 'কায়ব্যূহ'। চরিতামৃতের "কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ"-এর ইহাই তাৎপর্য্য।

তত্ত্ব যাহাই হউক, সখীহীন রাধাকৃষ্ণপ্রেম বৈচিত্র্যহীন প্রেমমাত্র, লীলা নহে। এই কারণে বৈষ্ণবমতে সখী 'লীলাবিস্তারিকা'। লৌকিক প্রেমের নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' অনসূয়া-প্রিয়ংবদাহীন শকুন্তলা-দুষ্মন্ত-প্রেম বর্ণহীন হইয়া যাইত—নাটকই সম্ভবপর হইত না। ভাগবতে 'নায়িকা' নাই ; সুতরাং সখী নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সখী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কল্পনা নহে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের জয়দেবে সখী আছে, 'রাধাপ্রেমামৃতে' সখী আছে, বিদ্যাপতিতে সখী আছে, এমন কি 'রাধাতন্ত্রে', 'পদ্মপুরাণে' ললিতা-বিশাখাদি পরিচিত নামসহ সখী আছে। রূপ গোস্বামী বিশাখা-ললিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিয়াছেন "শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ" ; এই 'শাস্ত্র' সম্পর্কে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় ভবিষ্যপুরাণ-স্কন্দপুরাণাদির নাম করিয়াছেন। 'রাধাতন্ত্র'-কে প্রাক্-চৈতন্যযুগের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বসন্তরঞ্জনও গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন সংস্করণে। সতীশচন্দ্রের "ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্ণবধর্ম্মরূপ কল্পতরুর পরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখা" —এই বিদ্রূপগূঢ় উক্তিটি তথ্যসম্মত নহে।

'মধুর' ও 'উজ্জ্বল' শৃঙ্গার-রসেরই নামান্তর। শৃঙ্গার-রসের দুইটি ভেদ : **বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ**।

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চারিটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

মিলনের পূর্ব্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় পূর্ব্বরাগ। আমাদের এই চয়নগ্রন্থে 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি', 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি' যথাক্রমে রাধার ও কৃষ্ণের রূপদর্শনজাত পূর্ব্বরাগ ; 'কেবা শুনাইল শ্যামনাম' রাধার কৃষ্ণনাম-শ্রবণজাত পূর্ব্বরাগ।

প্রতিনায়িকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নায়িকার মনে যে ঈর্ষাজনিত রোষের উদ্ভব হয়, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম মান। আমাদের "ধনি তেজি মানিনী" প্রভৃতি পদ এই সূত্রে পঠনীয়।

প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিয়সন্নিকর্ষে থাকিয়াও বিরহবোধ-জনিত যে বেদনা, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম **প্রেমবৈচিত্ত্য**। আমাদের চয়নে 'নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই' ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দেশান্তরগমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকাহৃদয়ে যে বিরহ-বেদনার সৃষ্টি করেন, সেই বেদনার আস্বাদ্য অবস্থা **প্রবাস**। আমাদের মাথুর অংশের পদ ইহার উদাহরণ।

ইহাদের প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ভ-নামক শৃঙ্গার-রস। ইহারা মাত্র ভালোবাসা, রোষ, বেদনা-বোধ নহে; পরন্তু উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগে তাহাদের আনন্দময় সংবিদ্-রূপ। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পদাবলী-কাব্য, বস্তুজগতের সাধারণ ঘটনা নহে।

সম্ভোগ নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় ভাব। ইহাও বাস্তব নহে, কাব্যগত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহু প্রকার সম্ভোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ'। ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাধা পরকীয়া বলিয়া পূর্ণ স্বতন্ত্রতা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে বৃন্দাবনলীলায় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কল্পনা করা কঠিন। রূপ গোস্বামী 'ললিতমাধব' নাটকে বৃন্দাবনের রাধাকে মায়িকভাবে দ্বারকায় লইয়া গিয়া সত্যভামায় রূপান্তরিত করিয়া মহারাজ কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। পরকীয়াকে স্বকীয়া করিয়া তবে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ দেখাইয়াছেন।

বিপ্রলম্ভই সম্ভোগকে পুষ্ট করিয়া সার্থক করে। এই কারণে রসব্যঞ্জনার সম্ভোগ অপেক্ষা অনেক উচ্চ আসন বিপ্রলম্ভের। বৈষ্ণব-মহাজনগণ অভিসারের পর মিলন, দানলীলা, নৌকাবিলাস, মানান্তে মিলন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে সম্ভোগের অনেক সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন বিপ্রলম্ভের পদে। এই জাতীয় পদের সংখ্যাও যেমন অত্যধিক, কাব্যোৎকর্ষও তেমনি। স্থূল বিচারে, সম্ভোগ মিলনসুখ এবং বিপ্রলম্ভ মিলনের অভাবজনিত বেদনাবোধ। বাস্তবসুখ যখন সাহিত্যিক আনন্দময়তা অর্থাৎ রসরূপতা লাভ করে, তখন অবশ্যই তাহাতে বৈচিত্র্য থাকে; কারণ সাহিত্য বস্তুর অনুকৃতিমাত্র নহে, ব্যঞ্জনাময় মানসপ্রকাশ। কিন্তু দুঃখকে রসোত্তীর্ণ করার অর্থাৎ নির্মল আনন্দরূপে পরিণতি দান করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব—এইখানেই কবি সত্যকার স্রষ্টা, "কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ"।

এইবার নায়িকার 'অষ্ট-অবস্থা'-র সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

(১) **অভিসারিকা**: প্রিয়মিলনার্থে সঙ্কেতকুঞ্জাভিমুখে যাত্রাকারিণী;
(২) **বাসরসজ্জা**: মিলনোদ্দেশ্যে নিজদেহসজ্জায় ও সঙ্কেতগেহসজ্জায় নিরতা;
(৩) **উৎকণ্ঠিতা**: উৎসুকভাবে নায়কের জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতিক্ষারতা;
(৪) **বিপ্রলব্ধা**: নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা;
(৫) **খণ্ডিতা**: প্রতিনায়িকার নিকট হইতে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখিয়া রুষ্টা;
(৬) **কলহান্তরিতা**: খণ্ডিতার আশ্রয় 'মান'—মানে কৃষ্ণকে হারাইয়া অনুতপ্তা;
(৭) **প্রোষিতভর্তৃকা**: নায়কের মথুরাগমনে বিরহিণী;
(৮) **স্বাধীনভর্তৃকা**: নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী—ইহাতে খণ্ডমিলনের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

আটটি শব্দের প্রত্যেকটি নায়িকার বিশেষণ।

(৪) পদাবলীর ভাষা

চৈতন্য-প্রভাবে উদ্দীপিত বাঙালীর নবচেতনার আনন্দময় বিলাস কাব্যসৃষ্টি। এই সৃষ্টি প্রধানতঃ দ্বিমুখী—চরিতকাব্য ও পদাবলীকাব্য। বাঙলা সাহিত্যে চরিতকাব্যের প্রথম স্রষ্টা বৈষ্ণব। সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া এই আনন্দবিলাস চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। শীতজীর্ণ মুহ্যমান বাঙালার সে যেন এক অভূতপূর্ব্ব বসন্তলীলা। রবীন্দ্রনাথের—

"বসন্তে আজি বিশ্বখাতায়
হিসাব নাইকো পুষ্পপাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।"

বাঙলার বৈষ্ণব যুগ সম্পর্কে বর্ণে বর্ণে সত্য। 'সকল প্রকার অজস্রত্ব' যাঁহাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা যে অনায়াসেই উদ্দামভাবে 'যোজন যোজন বাণী ছুটাইয়া' দিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাই দেখি পদাবলীতে বাঙলা, ব্রজবুলি, সংস্কৃত, সংস্কৃতমিশ্র বাঙলা, সংস্কৃতমিশ্র ব্রজবুলি, ব্রজবুলিমিশ্র বাঙলার সমারোহময় শোভাযাত্রা চলিয়াছে। এই বিচিত্র রূপের যথাক্রমিক উদাহরণ :

"ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে"—জ্ঞানদাস ;
"কুলমরিযাদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকী বাধা"—গোবিন্দদাস
"ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতম্"—গোবিন্দদাস ;
"দেখ সখি মধুর সুবেশম্"—বীরবাহ (পদ্যামৃতসিন্ধু) ;
"ধৈর্য্যং রহ ধৈর্য্যং হাম গচ্ছং মথুরা ওয়ে"—যদুনন্দন (?) ;
"রাই কিছু কহই ন পারি।
তুয়া রূপগুণের বালাই লৈয়া মরি॥"—নরহরি চক্রবর্ত্তী।

রাধা ও উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরাত্মক

"কস্ত্বং শ্যামলধামা? হরিকিঙ্কর হাম উদ্ধবনামা।
কুত্রতে কিং মধুনগরে? কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে।"

—চন্দ্রশেখর-রচিত এই পদখানির গঠন অদ্ভুত: প্রশ্ন দুইটির ভাষা সংস্কৃত, উত্তর দুইটির ব্রজবুলি, 'করি বিহরে' আবার বাঙলা। কথোপকথনের নাটকীয় রীতি সংস্কৃত নাটকের বিপরীত—রাধার কথা সংস্কৃত, উদ্ধবের প্রাকৃত (ব্রজবুলিকে প্রাকৃত ধরা হইল)।

বাঙলা-সংস্কৃত-ব্রজবুলির এই সমমূল্যনির্দ্ধারণ যেন "ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ"-এর জীবন্ত প্রতিবাদ। শুধু তাহাই নহে। যে চৈতন্যধর্ম্ম দ্বিজ-চণ্ডালকে ভক্তির ক্ষেত্রে একাকার করিয়াছে, তাহারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপেই বাঙলা-সংস্কৃত-ব্রজবুলি একাসনে বসিয়াছে—বৈষ্ণবপরিধির মধ্যে সংস্কৃত-বাঙলা সবই 'দাস' হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের সংস্কৃত গীতগুলি সহজেই বাঙলা পদাবলী-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর, রায় রামানন্দের এবং চৈতন্যোত্তর কালের গোবিন্দদাস, রাধামোহন প্রভৃতির সংস্কৃত পদও বাঙলা পদাবলীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের

পদ বাঙলা, বিদ্যাপতির মৈথিল। পরকীয়াবাদী বিদ্যাপতিকে চৈতন্যোত্তর বাঙলা আত্মসাৎ করিয়াছে।

ব্রজবুলি ঃ

মৈথিলের ভিত্তিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ মধুর সাহিত্যিক ভাষায় বাঙলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য মহাজন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথও পদ রচনা করিয়াছেন। এই কৃত্রিম মৈথিলকে বলা হয় 'ব্রজবুলি'; কারণ, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের মতে, জনসাধারণ বৈষ্ণব কবিদের ঐ নূতন ভাষা শুনিয়া মনে করিল যে, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ ঐ ভাষাতেই কথা বলিতেন, উহা 'ব্রজের বুলি', তাই উহার নাম হইল ব্রজবুলি। এই ব্যাখ্যাটি কাল্পনিক। নামটিরও বয়স বেশী নহে; কারণ, প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখি না। নামটি এখন আমরা সম্প্রসারিত অর্থেও প্রয়োগ করি অর্থাৎ যে সকল পদে রাধাকৃষ্ণ বা ব্রজলীলার প্রসঙ্গ নাই, তাহাদেরও মিশ্র-মৈথিল বাহনটিকে আমরা ব্রজবুলি বলি। আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখিতেছি যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাঙলা, উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা করা যা'ক্।

আসামের প্রসিদ্ধ ভক্তকবি শঙ্করদেব মহাপ্রভু অপেক্ষা চব্বিশ বৎসরের বড় ছিলেন। পুরীতে একসময়ে উভয়ের সাক্ষাৎও হইয়াছিল। আসামে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম চৈতন্য ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন—চৈতন্যদেব পরকীয়াবাদী, শঙ্করদেব স্বকীয়াবাদী। শঙ্কর-রচিত 'রুক্মিণীহরণ', 'পারিজাতহরণ' দ্বারকার কথা, বৃন্দাবনের নহে। তিনি 'পারিজাতহরণ' নাটকখানি গঠন করিয়াছেন মিথিলার কবি উমাপতির 'পারিজাতহরণ' নাটকেরই আধারে —উমাপতির বাহন সংস্কৃত-প্রাকৃত-মৈথিল, শঙ্করদেবের সংস্কৃত-অসমীয়া-ভগ্ন-মৈথিল; উভয় নাটকই গদ্য-পদ্যাত্মক। এখানে যে উমাপতির প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং বিদ্যাপতির মাত্র পরোক্ষ একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। শঙ্করের মৈথিলানুগ ভাষা সত্যই সুন্দর: "হরি হরি পিয় মোরি বৈরি অধিক ভেলি, কয়লি অতয়ে অপমানা" ভাষায়, ব্যাকরণগত ত্রুটিসত্ত্বেও, মৈথিল কবিকে এবং ছন্দে মৈথিল কবির ("অরুণ পুরব দিশি বহলি সগর নিশি, গগন মগন ভেল চন্দা"—উমাপতি) ভিতর দিয়া জয়দেবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্তিটি দ্বারকার মহারাজ (মাধুর্য্যের নহে, ঐশ্বর্য্যের প্রতীক) কৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার। ইহা 'ব্রজের বুলি' নহে, সুতরাং তথাকথিত ব্রজবুলি নহে।

বাঙলাদেশে চৈতন্যপ্রভাবের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত মিশ্র-মৈথিল পদ মাত্র একখানি রহিয়াছে—যশোরাজ খান ভণিতাযুক্ত "এক পয়োধর চন্দনলেপিত···"। ইহাতে বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) নাম আছে। রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভও হইতে পারে, পঞ্চদশের শেষও ধরা চলে। পদখানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে রচিত পীতাম্বর দাসের বৈষ্ণব রসগ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'তে নায়িকা রাধার অবস্থা-বিশেষের উদাহরণরূপে গৃহীত হইয়াছে; আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। যশোরাজ নাকি শ্রীখণ্ডবাসী, একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা এবং পদখানি নাকি ঐ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকারের শ্রীখণ্ড চৈতন্য-সমকাল হইতেই বৈষ্ণবতীর্থ। চৈতন্যপ্রভাবের

অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত শ্রীখণ্ডেরই যশোরাজের কাব্য-সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্য্যন্ত শ্রীখণ্ড নীরব। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডের গোপাল দাস হঠাৎ যশোরাজের কথা বলিলেন এবং তৎপুত্র পীতাম্বর একখানি পদ উদ্ধার করিলেন। তাহার পর হইতে আবার সকলে নীরব। বিশাল নীরবতার বুকে আকস্মিক একটি বুদ্‌বুদের মত যশোরাজ জাগিয়াই মিলাইয়া গেলেন। কেন? গুণরাজখানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রাধাহীন হইয়াও মহাপ্রভুর প্রশংসা লাভ করিল; অন্যদিকে অমন সুন্দরপদযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলা থাকা সত্ত্বেও যশোরাজের কাব্য কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। কেন? অবস্থাটা সন্দেহজনক। তাঁহার নামাঙ্কিত পদখানির নায়িকাও সন্দেহের অতীত নহেন। পূর্ব্বাপর-প্রসঙ্গহীন ছিন্নসূত্র বর্ণনা হইতে নায়িকা স্বকীয়া কি পরকীয়া তাহা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় না। স্বকীয়া বলিয়াই মনে হয়; কারণ, ইনি ঘরের চৌকাঠের বাহিরে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছেন —"আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে"। বিচ্ছিন্ন পদখানির নায়িকাকে পীতাম্বর রাধা করিয়াছেন হয়তো যুগানুগত কল্পনায়, যেমন ঐ শতাব্দীরই শেষভাগে (১৬৯৬ খ্রীঃ) রচিত 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকার অনেক কিছু করিয়াছেন প্রখ্যাতনামা টীকাকার আচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে উদ্ধৃত "যাতে দ্বারবতীম্" ইত্যাদি রাধাবিরহ কবিতাটি বসাইয়াছেন 'নান্দীমুখী'র মুখে। কবিতাটি দেখিতেছি 'ধ্বন্যালোক্'-এর 'লোচন' টীকায়। একাদশ শতাব্দীর আচার্য্য অভিনব গুপ্ত-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কবিতায় ষোড়শ শতাব্দীর 'নান্দীমুখী' কেমন করিয়া যাইবে? অথচ ধ্বন্যালোকও বিশ্বনাথের অপরিচিত ছিল না; কারণ, উহারই ভিত্তিতে রচিত কবি-কর্ণপুরের 'অলঙ্কার কৌস্তভ'-গ্রন্থের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—টীকার নাম 'সুবোধনী'। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অজস্র আছে। এইরূপ ব্যাপারকেই আমি যুগানুগত কল্পনা বলিয়াছি। যশোরাজের পদখানির নায়িকা স্বকীয়া হইলে প্রভাব উমাপতির, পরকীয়া হইলে বিদ্যাপতির।

চৈতন্যপ্রভাবের পূর্ব্বে রচিত মিশ্র-মৈথিল পদ উড়িষ্যাতেও পাইতেছি মাত্র একখানি —রায় রামানন্দের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল···"। মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলন-কালেই (১৫১০) পদখানি তিনি গাহিয়াছিলেন প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের উদাহরণরূপে। সুতরাং উহার রচনাকাল চৈতন্যপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম, অথবা পঞ্চদশের শেষ ভাগ। উক্তি পরকীয়া রাধার। ভাবে স্থূলতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৪।৩।২১— 'গৌরচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রিকা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি) এবং বিশেষতঃ একটি সুপ্রাচীন অর্থাৎ 'দশরূপক'-এর টীকায় দশম শতাব্দীর আচার্য্য ধনিক-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত সংস্কৃত কবিতার ("কো' সৌ, কাস্মি, রতং নু কিং কথামিতি, স্বল্পাপি মে ন স্মৃতিঃ") ছায়া। মিশ্র-মৈথিলে অন্য পদ তিনি রচনা করেন নাই; করিলে মহাপ্রভুর দীর্ঘকালের ভক্তসঙ্গী এই অসাধারণ ব্যক্তির পদ কখনই অসংগৃহীত থাকিত না। ঐ একখানিমাত্র পদে রায় রামানন্দ মিশ্র-মৈথিলের যে পরিণত রূপ দিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এ ভাষায় আসামে শঙ্করদেব অজস্র পদ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু উড়িষ্যায় শুধু রামানন্দের ঐ পদখানিতেই ব্রজবুলির প্রথম ও শেষ রূপায়ণ। উড়িষ্যায় মহাপ্রভুর প্রভাব এত গুরুতর যে, তাঁহাকে ও তাঁহার 'মধুর রস'কে লইয়া বহু গান, বহু কাব্য ওড়িয়া ভক্তকবি তিন শতাব্দী যাবৎ রচনা করিয়াছেন। ষোড়শ

শতাব্দীর দীনকৃষ্ণ, গোবিন্দ ভঞ্জ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশের শ্রীহরিদাস, দীনবন্ধু, বৃন্দাবতী, মুসলমান বৈষ্ণবী সালবেগ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অষ্টাদশের সদানন্দ কবিসূর্য্য, অভিমন্যু সামন্ত সিংহার প্রভৃতির কেহই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন নাই ; ইহাদের পদের ভাষা ওড়িয়া (অধ্যাপক বিনায়ক মিশ্র রচিত 'ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত সালবেগের তিনখানি পদের একটির ভাষা ওড়িয়া, একটির ব্রজভাষা (মথুরাঞ্চলের কথিত), তৃতীয়টির ব্রজবুলিগন্ধি (ঠিক ব্রজবুলি নহে)। সুতরাং বাঙলাদেশ হইতে ব্রজবুলি পদ-রচনার ধারা উড়িষ্যায় প্রচলিত হইয়াছিল বলা তথ্যসম্মত নহে।

ধারাপ্রবর্তন একমাত্র বাঙলাদেশেই হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুর সমকাল হইতেই তাঁহার দ্বারা আস্বাদিত ও বহুমানিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ধারার প্রথম প্রবর্তক মুরারী গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি। মুরারির "তপন কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিষেকে···" অথবা বাসু ঘোষের "ভাঙ-ভুজঙ্গম দংশল মঝু মন, অন্তর কাঁপয়ে মোর···"-এ মিশ্র-মৈথিলের যে পরিণত রূপ দেখিতেছি, তাহা অজ্ঞাত একটা ভাষার অন্ধ অনুকরণে সম্ভব নহে। বৈষ্ণব-যুগের মহাজনদের ব্রজবুলি-পদাবলীর প্রকাশ এত স্বচ্ছন্দ, প্রবাহ এত সাবলীল যে, মনে হয় এ ভাষা যেন তাঁহাদের মাতৃভাষা। অথচ প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও 'ভানুসিংহের পদাবলী'র ভাষা দুর্বল ও বিকৃত। তাঁহার বিখ্যাত পদ 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'-এর 'মৃত্যু অমৃত করে দান', 'কি ভয় তাহারে' খাঁটি বাংলা ; 'ভইবি', 'আসব', 'টুটাইব', 'দুরাওল' ব্রজবুলি নহে—ব্রজবুলির কান ইহাতে পীড়া অনুভব করে। ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের কাল-ব্যবধান, মিথিলা-বাঙলার যোগক্ষেত্র হইতে রবীন্দ্র-নাথ বিচ্ছিন্ন। বৈষ্ণবযুগের পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষিত বাঙালী যে মৈথিল ভাষায় মোটামুটি কথা বলিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ "এক বংগালী, দোসর তোতরাহ" (একে বাঙালী, তাতে তোতলা) এই প্রসিদ্ধ মৈথিল প্রবচনটি (ইহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সনের Chrestomathy, ২১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিদ্যাপতিও যে বাঙলা বলিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার "কহিঅ না পারিঅ পহমুখ ভাসা" : 'কহিতে পারা'-র 'পার্' ধাতু 'সমর্থ হওয়া' (to be able) অর্থে বিদ্যাপতি প্রয়োগ করিয়াছেন ; এ অর্থ বাঙলা এবং এই অর্থে ধাতুটির প্রয়োগ মিথিলায় আগেও ছিল না, আজও নাই (Chrestomathy, ২০৬-৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বাঙলা-মিথিলার ঘনিষ্ঠ যোগের জন্য উভয় স্থানেরই শিক্ষিতদের অনেকে পরস্পরের ভাষা বুঝিতে ও মোটামুটি বলিতে পারিতেন। তদানীন্তন বাঙলার অঙ্গীভূত আসামের প্রায় বাঙলাভাষী শঙ্করদেবও মৈথিল বলিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্রজবুলি মৈথিলের অনুকরণ নহে, বাঙলা প্রভৃতির সহিত মৈথিলের ক্ষেত্রোপযোগী সমীকরণ ; কিন্তু সচেতন প্রয়াসের দ্বারা নহে, আপন আপন মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে। মনে রাখিতে হইবে যে, তদানীন্তন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙলার সারস্বততীর্থ ছিল এবং স্বভাবতঃই তাহার উপর মৈথিল ভাষার একটা আকর্ষণ ছিল। মিথিলাতেই ব্রজবুলির ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়া-ছিল—বিদ্যাপতি-উমাপতি স্বয়ং এ কাজ করিয়াছিলেন। শৈব মিথিলায় বৈষ্ণব ভাবধারা বর্ষিত হইয়াছিল বাঙলারই "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" হইতে। সেই ধারা-পানে যে কয়টি চাতক

আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিল, উমাপতি-বিদ্যাপতি তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। সাধারণ মিথিলাবাসী যে সে-গানে মুগ্ধ হইবে না এবং বাঙালীই তাহা কান পাতিয়া শুনিবে, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী রচনায় তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছিলেন সরলতর ভাষা। আমাদের বিশ্বাস উমাপতি-বিদ্যাপতি সমকালীন। ভণিতায় 'হিন্দুপতি' প্রয়োগ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, উমাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রাজা হরিসিংহকেই বুঝাইতেছেন ; 'হিন্দুপতি' বিদ্যাপতিও প্রয়োগ করিয়াছেন (Chrestomathy, ২৭ সংখ্যক পদ)। বিদ্যাপতির 'হরগৌরী' পদাবলীর কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য মৈথিল দেখিয়া মনে হয় এ পদ রচনায় মিথিলার বাহিরে তাহার দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল বৈষ্ণবপদ রচনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির প্রতি মিথিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয়। গ্রিয়ার্সনের ও আধুনিক মৈথিল পণ্ডিতদের সহায়তায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষাকে খাঁটি মৈথিল বানাইবার অমানুষিক চেষ্টা সত্ত্বেও 'হরগৌরী' পদের ভাষার সহিত ইহার পার্থক্য আজও সুস্পষ্ট। পাঠক তুলনায় পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(৫) পদাবলীর ছন্দ

জয়দেব যে-বাঙলাভাষায় কথা বলিতেন বা গান করিতেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অপভ্রংশ। চর্য্যাপদের বাঙলাগন্ধি গানগুলি হয়তো ঐ সময়ে বা কিছু পরে রচিত। গীতগোবিন্দের গীতসমূহ অপভ্রংশ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও ধ্বনির সৌন্দর্য্যতত্ত্বে সিদ্ধ জয়দেবের স্বকীয়তাও উহাতে প্রচুর। ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল পদাবলীর ছন্দের অনুসরণ। উমাপতি-বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ হইতে আগত। তবু মনে হয়, মৈথিল ও ব্রজবুলি দুইয়েরই উপর জয়দেবের প্রভাব গুরুতর।

স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ-বিচার মাত্রাচ্ছন্দ ব্রজবুলির প্রাণ হইলেও সর্ব্বত্র এ নিয়ম যে নিখুঁত-ভাবে মানিয়া চলা হয় না, তাহার কারণ পদগুলি গান—পাঠে যাহা ভুল বলিয়া মনে হয়, সুরে তাহা ঠিক হইয়া যায়। এই কারণে ছন্দের কাঠামোটির দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কানের একটু শিক্ষাও আবশ্যক।

ব্রজবুলির (সকল মাত্রাচ্ছন্দেরই) ছন্দ বুঝিবার সুবিধার জন্য কয়েকটি সূত্র নির্দ্দেশ করিতেছি। যে ন্যূনতম মাত্রাসংখ্যা ছন্দ-বিশেষের স্বরূপটি চিনিতে সাহায্য করে, তাহাকে আমরা 'চা'ল' বলিব (অনেকটা সঙ্গীতে রাগবৈশিষ্ট্যসূচক 'পাকড়'-এর মত)। মোটামুটি চা'ল চারিটি—তিনের, চারের, পাঁচের ও সাতের অর্থাৎ তিনমাত্রার, চারমাত্রার, পাঁচমাত্রার ও সাতমাত্রার। আঁখিতে (৩) ; আঁখিপাতে (৪) ; আঁখিতে মম (৫) ; আঁখিতে নিতি মম (৭)। বাঙলা উদাহরণ দিলাম সহজে বুঝা যাইবে বলিয়া। দ্রুত পড়িলেই চলনের পার্থক্যটুকু কানে ধরা পড়িবে। ব্রজবুলির উদাহরণ : নেহ ; মীললি ; পন্থ ইহ ; বিজুরি চমকত। প্রথমটির (তিনমাত্রার) কথা শেষের দিকে বলিব।

(ক) চারমাত্রার চা'লের ছন্দ :

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
(১) গোবিন্দদাসের—"ইথে যদি-সুন্দরি-তেজবি-গেহ।
প্রেমক-লাগি উপেখবি-দেহ ॥······"

অপভ্রংশ চর্যাপদের—"সোনে-ভরিতী-করুণা-নাবী।
রূপা-থোই-মহিকে ঠাবী ॥······"

ও জয়দেবের— "মুহুরব-লোকিত-মণ্ডন লীলা।
মধুরিপু-রহমিতি-ভাবন-শালা ॥"

—(হাইফেন্ চা'ল দেখাইবার জন্ম আবশ্যক হইলে পরেও ব্যবহার করিব।)

দেখা যাইতেছে যে, চারমাত্রার মূলটি চারবার আবৃত্ত হইয়া ষোলমাত্রার সৃষ্টি করিয়াছে। আটমাত্রার পর যতি, ষোলমাত্রার পর পূর্ণ বিরতি। এই ষোলমাত্রার ছন্দটির নাম 'পাদাকুলক'। সংস্কৃত উদাহরণটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে নিখুঁত ষোলমাত্রা। অপভ্রংশ উদাহরণের 'থোই'র 'ই' হ্রস্বস্বর একমাত্রা হইলেও ছন্দের জন্ম দ্বিমাত্রিক। ব্রজবুলির 'ইথে'-র 'থে' দীর্ঘস্বরান্ত হইলেও ছন্দের খাতিরে একমাত্রিক। এই জাতীয় ছন্দে পঙ্‌ক্তির অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইলেও প্রয়োজনমত দ্বিমাত্রিক ধরার বিধি আছে। আধুনিক বাঙলা কবিতাতেও এই পাদাকুলক ছন্দ দেখা যায় :

"ওস্তাদ-ঝোঁকে ওঠে-প্যাচ মারে-কুস্তির,
জল সাব-কি ক'রে যে-থাকে বলো-সুস্থির।"—রবীন্দ্রনাথ

পাদাকুলক ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরীতে নাই; আছে প্রাকৃতপৈঙ্গলে ও তাহার পূর্ব্বকালীন সংস্কৃত বৃত্তরত্নাকরে। অপভ্রংশ ও সংস্কৃত পাদাকুলক একই লক্ষণাক্রান্ত—স্বরের লঘু-গুরু-(হ্রস্ব-দীর্ঘ) সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মহীন ষোলমাত্রার ছন্দ পাদাকুলক ("লহ গুরু এক ণিয় ণহি জেহা। ···সোরহমত্তা পাআকুলঅং।"—প্রা· পৈ·, "অনিয়তবৃত্তপরিমাণসহিতম্। প্রথিতং জগৎসু পাদাকুলকম্॥" —বৃ· র·)। পাদাকুলককে 'পজ্ঝটিকা' ছন্দ বলিলেও ক্ষতি হয় না। যদিও মাত্রাসমক, চিত্রা, উপচিত্রা, পজ্‌ঝটিকা প্রভৃতি নামে বিশেষ বিশেষ মাত্রাবিন্যাস-নিয়মের ষোলমাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তবু কোনও বিশেষ নিয়ম না মানিয়া সব লক্ষণই মিলাইয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "মোহমুদ্গর"-এর ছন্দোনাম দিয়াছেন পজ্ঝটিকা ('ষোড়শপজ্‌ঝটিকাভিরশেষঃ')।

(২) গোবিন্দদাসের—

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ১ ১ ৩ ২
"কণ্টক গাড়ি কমলসমপদতল | মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি"

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন- | কোমলমলয়সমীরে"-র ছাঁচে ঢালা আটাশমাত্রার ছন্দ হইলেও ষোলমাত্রার পাদাকুলকেরই দ্বিরাবৃত্তি, শুধু দ্বিতীয়াংশে চারিটি মাত্রা ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। "মাধব তুয়া অভিসারক লাগি" উক্ত সংস্কৃত গানের ধ্রুবাংশ "বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে"-র মত ষোলমাত্রার। "করকঙ্কণপণ ফণিমুখবন্ধন" যে অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও জয়দেবের অন্য একটি গানের "মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং" জাতীয়।

বলিয়াছি 'কণ্টক গাড়ি'-তে শেষ চারিমাত্রা ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে কবি না ছাটিতেও পারেন, যেমন গোবিন্দদাসেরই 'চম্পকশোণ'-পদের "নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলাওত, | গাওত কত কত ভকত হি মেলি"—পূর্ণ ১৬+১৬=৩২ মাত্রা, আবার ঐ পদেরই 'চম্পক'-পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয়াংশে মাত্রাসংখ্যা চৌদ্দ—"জিতল গৌরতনু লাবনি রে" এই প্রকার ছন্দের কিছু নিদর্শন রহিয়াছে চর্য্যাপদের চৌত্রিশসংখ্যক গানে—"কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে। কিন্তো রে ঝানবখানে" ('ন্তোরে' দ্রুত উচ্চারণে দুইমাত্রা)। ঠিক এই ছন্দ প্রাকৃতপৈঙ্গলে নাই; 'তবে, চউপইয়া' (চতুষ্পাদিকা) ছন্দের প্রথম দুইমাত্রা বাদ দিয়া পড়িলে অবিকল 'কণ্টক গাড়ি'-র ছন্দ পাওয়া যায়: "(জাসু) সীসহি গংগা গোরি অধংগা। গিম পহিরিঅ ফণিহারা"। রবীন্দ্রনাথের "জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা" প্রধানতঃ 'কণ্টক গাড়ি'-র ছন্দে রচিত।

(খ) পাঁচমাত্রার চা'লের ছন্দ ঃ

শশিশেখরের—

> "তুঙ্গমণি মন্দিরে | ঘনবিজুরি সঞ্চরে।
> মেঘরুচি বসন পরি | ধানা"

জয়দেবের—

> "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
> দেহি পদপল্লবমুদারম্"

এরই ছন্দের আধারে রচিত। প্রতি দশমাত্রার পর যতি। উদ্ধৃত পদ দুইখানির প্রত্যেকটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কুড়িমাত্রা এবং দ্বিতীয়ে চৌদ্দ অর্থাৎ ১০+১০ ও ১০+৪। 'উৎসর্গ' পুস্তকের 'ছল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটিতে কুড়িমাত্রা (১০+১০) দিয়াছেন, 'লেখনে' "লাজুক ছায়া বনের তলে" (প্রথম পঙ্‌ক্তি)-তে দশমাত্রা ও "আলোরে ভালো-বাসে" (দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি)-তে সাতমাত্রা (৫+২) দিয়াছেন। চা'ল পাঁচমাত্রার; ছন্দ পূর্ণতা লাভ করে দশে। এই দশের বিচিত্র আবৃত্তির দ্বারা কবিরা ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। দশমাত্রাতে ছন্দের পূর্ণতা বলার কারণ এই যে, আধুনিক কালে সাধারণ কবিতায় আসিলেও মূলে ছন্দটি সঙ্গীতের দশমাত্রার 'ঝাঁপতাল' (৫+৫)। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে এই ছন্দের নাম 'ঝুল্লনা' এবং সেখানেও জোর দশের উপর—"পঢম দহ দিজ্জিআ। পুণবি তহ কিজ্জিআ" ইত্যাদি (দহ=দশ; প্রথমে দশ দিয়া, পুনরায় তাহাই করিয়া…)। প্রাকৃতপৈঙ্গলে আর একটি এইভাবের ছন্দ রহিয়াছে; নাম 'নিশিপাল'। ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত। ইহার মাত্রাবিন্যাস-নিয়ম বাঁধা—প্রথমে দীর্ঘ, পরে তিনটি হ্রস্ব; এইরূপ পরপর তিনবার; তারপর দীর্ঘ-হ্রস্ব—দীর্ঘ ("হারু ধরু, তিণ্ণি সরু। হিণ্ণি পরি, তিগ গণা" ইত্যাদি)। ঠিক এই লক্ষণ পাইতেছি জয়দেবের "নীলনলিনাভমপি তন্বি তব, লোচনম্", ব্রজবুলির "সোই যদি, তেজলকি কাজ ইহ, জীবনে" এবং রবীন্দ্রনাথের "পুণ্য হ'ল, অঙ্গ। মম ধন্য হ'ল,

অন্তর"-তে, যদিও গানগুলি মাত্রাছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে এই জাতীয় ছন্দ নাই। উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে আমাদের ঝাঁপতালের নাম 'ঝুলা'। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই 'ঝুলা' নামই রহিয়াছে। আমরা ইহার 'ঝুলন' নাম রাখিতে চাই।

(গ) সাতমাত্রার চা'লের ছন্দ ঃ

বিদ্যাপতির—

১ ১১ ১২১ | ১১১ ২ ১১ | ২
"এ সখি হমারি | দুখের নাহিক | ওর

১ ১১ ২১১ | ২১ ২১১ | ২১ ২১১ | ২
এ ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর"

এবং রায় শেখরের —

১১ ১ ১১১১ | ২১ ২১১ | ১১১ ২ ১ ২ | ১১১২
"গগনে অবঘন | মেহ দারুণ | সঘন দামিনী | ঝলকই"

সাতমাত্রার ভিত্তিগত ছন্দে রচিত। এমনি একখানি গান [গীতসংখ্যা ৭] জয়দেবে দেখিতেছি :

২ ১ ২১১ | ২১২ ১১ | ২১ ২১ ১ | ২ ১
"দেহি সুন্দরি | দর্শনং মম | মন্মথেন দু- | নোমি"

—এই পঙ্ক্তিটিতেই লক্ষণ পরিস্ফুট। ৭=৩+৪ ; সূক্ষ্মহিসাবে ৩+ (২+২)। মনে হয়, সাতমাত্রাতেই এ ছন্দ পূর্ণতা পায়। সাতের দুই বা ততোধিক বার আবৃত্তি করিয়া এবং আবৃত্ত অংশে পূর্ণ সংখ্যা সাত রাখিয়া অথবা সঙ্গতভাবে মাত্রাসংখ্যা কমাইয়া কবি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতির পদখানির উদ্ধৃত পঙ্ক্তিদ্বয়ে শেষাংশে মাত্রাসংখ্যা দুই ; আবার পরবর্তী পঙ্ক্তিগুলির প্রত্যেকটির শেষাংশমাত্রা পাঁচ (-খণ্ডিয়া···)। এই জাতীয় ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে নাই, পৈঙ্গলে নাই ; চর্যাপদে এই ছন্দের পদ নাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই ইহা সোজাসুজি আধুনিক বাঙলা কবিতায় আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন ('খাঁচার পাখী ছিল', 'বেলা যে প'ড়ে এল', 'গাহিছে কাশীনাথ', 'উতল সাগরের···)। এই সপ্তমাত্রিক গঠনটির সাঙ্গীতিক নাম 'রূপকতাল'। কবিতার ছন্দোরূপে রূপক ছন্দই ইহার যোগ্য নাম। ছন্দের মূলসূত্র-নির্ণয়ে সঙ্গীতের কথা বিশেষ করিয়া ভাবিতে হয় ; কারণ, আগে গান পরে কবিতা, আগে তাল পরে ছন্দ।

(ঘ) তিনমাত্রার চা'লের ছন্দ ঃ

তিনমাত্রার চা'লের ছন্দ বিদ্যাপতিতে নাই, জয়দেবে নাই। ব্রজবুলিতে এই গতি ভঙ্গীর সৃষ্টি বৈষ্ণবকবির। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ ইহার বিচিত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাও সঙ্গীতের তাল হইতে আসিয়াছে। বারোমাত্রা (অর্থাৎ চারিবার আবৃত্তি তিনমাত্রা)-র তাল 'একতালা' ; ছয়মাত্রার পরে 'সম'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখিতেছি যে বারোমাত্রাতেই ছন্দের পূর্ণতা ধরা হইয়াছে, ছয়ের পর পড়িয়াছে 'যতি', (সঙ্গীতের 'সম') —"ক্ষমা করো মোরে, | কুমার কিশোর"। এই বারোর দুইবার আবৃত্তির দ্বারা পঙ্ক্তিকে

প্রয়োজনমত দীর্ঘ করা হয়; দ্বিতীয় অংশে মাত্রাসংখ্যা কম থাকে। "বাতাস, হয়েছে, উতলা, আকুল"-এ তিনমাত্রায় চা'লটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

(১) শেখরের—

"আওয়ত শ্রী | দামচন্দ্র | রঙ্গিয়া পাগড়ি | মাথে"

ঐ তিনমাত্রা চা'লের বারোমাত্রার আধারে রচিত। পঙ্ক্তিটিতে বারোর দুইবার অর্থাৎ ছয়ের চারিবার আবৃত্তি—শেষাংশে মাত্রাসংখ্যা চার (পূর্ণ যতি)। এই পদখানির স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘবিন্যাস নিখুঁতভাবে দেখা যাইবে "স্ফুট চম্পক- | দলনিন্দিত | উজ্জ্বল তনু | শোভা"-তে। বাংলা মাত্রাছন্দে যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বস্বর, হসন্ত বর্ণের পূর্বস্বর, অনুস্বার বিসর্গের পূর্বস্বর, 'ঐ' 'ঔ' দ্বিমাত্রিক; বাকী পূর্ণ উচ্চারিত স্বরমাত্রই একমাত্রিক (হ্রস্ব)। পদকর্তা এখানে সংস্কৃত-বাংলা মেশামেশি করিয়াছেন। 'রঙ্গিয়া'-কে দ্রুত উচ্চারণে 'রঙিয়া', কিন্তু 'অঙ্গদ'-কে 'অংগদ' পড়িতে হইবে। "ধৈর্য্যং রহ | ধৈর্য্যং হৃম্ | গচ্ছং মথু- | রায়ে" পদখানিও এই ছন্দে রচিত। এই পদের "মথুরা-বাসিনী | এক রমণী"-তে তিনের লক্ষণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের "নির্জন পথে | জ্যোৎস্না আলোতে | সন্ন্যাসী একা | যাত্রী" এবং "দহনশয়নে তপ্তধরণী" (গীতবিতান) যথাক্রমে "ধৈর্য্যং রহ…" ও "মথুরাবাসিনী এক রমণী"র সহিত মিলাইয়া পড়া যাইতে পারে।

(২) জগদানন্দের "মঞ্জুবিকচকুসুমপুঞ্জ…" এবং শশিশেখরের "আজ অদ্ভুত তিমিররঙ্গ…" ঐ তিনমাত্রার চা'লের বারোমাত্রার আধারে রচিত দীর্ঘচতুষ্পদী। প্রথম তিন পঙ্ক্তির প্রত্যেকটির মাত্রাসংখ্যা বারো এবং শেষ পঙ্ক্তির প্রথম গানটিতে দশ ("মঞ্জুলকুলনারী") ও দ্বিতীয়টির এগারো (অঙ্কুশ নাহি মান রে)—এইখানেই পূর্ণ যতি। রবীন্দ্রনাথের—

"গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে" —

সজনি আও আও লো"—ভানুসিংহ

"আজু অদ্ভুত…" পদেরই মত ১২ + ১২ + ১২ + ১১। বৈষ্ণবকবির মত রবীন্দ্রনাথও বহু স্থলে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বমূল্য ধরিয়াছেন—"ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা"-র তিনটি 'এ' একমাত্রিক। (এই পঙ্ক্তিটি "গহনকুসুমে"র সগোত্র নহে; ইহাতে চারের চা'ল)।

নিষ্প্রয়োজন বলিয়া পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত-ছন্দের আলোচনা করিলাম না। কেবল দুটি বিশেষ রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(১) "আজু কে গো মুরলী বা-জায়।
এত কভু নহে শ্রাম-রায়।"

—সংস্কৃতে উচ্চারণগত স্বাভাবিক কারণে সর্বত্রই অক্ষর=বর্ণ ও syllable দুই-ই—

বাংলা অক্ষরবৃত্তে তাহা নহে—পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে বর্ণসংখ্যা এক ; syllable সংখ্যার তারতম্য ঘটতে পারে। আমাদের এই উদাহরণটিতে দুটি পঙ্ক্তিতেই বর্ণ সংখ্যা দশ, অক্ষরসংখ্যা নয় (৯)। এই গানেরই "এত নহে নন্দসুত কানু"-তে বর্ণ ও syllable দুই-ই দশ ; "আবার এনা বেশ কোন দেশে ছিল" -তে বর্ণ দশ, syllable আট। এই জটিলতা এড়াইবার জন্য আমরা syllable-এর প্রশ্ন না তুলিয়া অক্ষর=বর্ণ ধরিলাম। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, ব্যঞ্জনান্ত syllable-এর (যেমন 'বেশ', 'কোন') হসন্ত ব্যঞ্জনে যেমন 'শ্', 'ন্' syllable না থাকিলেও তাহার দ্যোতনা রহিয়াছে। অর্থাৎ 'বেশ', 'কোন' প্রকৃতপক্ষে দুটি syllable-এরই প্রতীক। গানখানির ছন্দ দশাক্ষর, ছন্দোনাম 'দিগক্ষরা', যতি অষ্টমাক্ষরে, পূর্ণ যতি দশমে এবং চা'ল চা'রের।

চণ্ডীদাসের "বহু দিন পরে | বঁধুয়া এলে" ও মাধব ঘোষের "ব্রজবাসিগণ্ | জীবনশেষ" পদ দুইখানির ছন্দ একাদশাক্ষরা 'একাবলী', যতি ষষ্ঠে ও পূর্ণ যতি একাদশে, চা'ল তিনের। 'দিগক্ষরা'র মত অষ্টমাক্ষরে যতিবিশিষ্ট একপ্রকার একাবলী আছে :

'সভাস্থলে নরপতি | আসিয়া
মন্ত্রিবরে কহিলেন | হাসিয়া।'

ইহার সহিত পূর্বরূপটির গতিপার্থক্য সহজেই বুঝা যাইবে।

(৬) বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য

রবীন্দ্রনাথের বহু স্থলে বৈষ্ণবলক্ষণ এত বেশী যে, মনে হয় তাঁহার উপর বৈষ্ণবপ্রভাব গুরুতর। কিন্তু এই মনে-হওয়া যে সত্য নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য প্রথমে রবীন্দ্রকাব্য-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণব ভক্তিবাদী, রবীন্দ্রনাথ ভক্তিবাদী। কিন্তু

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসার-ভবনদ্বারে।"

ইহাই মহাকবির ভক্তিস্বরূপ। শ্রীচৈতন্য কিন্তু 'ভাবোন্মাদমত্ততা'রই মূর্তিমান বিগ্রহ। কবির ভক্তি 'শান্তিরস', রসশাস্ত্রের 'শান্তরস' নহে। শান্তরসে জগৎ অসার বলিয়া

বিষয়াসক্তিহীন চিত্তে সারাৎসার ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা, স্বাস্থিতার নির্দ্দেশ। কিন্তু কবির কামনা

"যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তা'র মাঝখানে।"

বৈষ্ণবেরও দৃশ্য-গন্ধ-গান আছে, কিন্তু উদ্দীপনবিভাবরূপে। রবীন্দ্রনাথের ইহাই আলম্বন-বিভাব; কারণ, ইহা অরূপেরই রূপলীলা। এক এক সময়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বুঝি বৈষ্ণবের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, রাধা তাঁহার হ্লাদিনীর নারীরূপ; রাধাকৃষ্ণের মধুর রসলীলা কৃষ্ণ-কর্তৃক আপনাকে আপনি আস্বাদন। রবীন্দ্রনাথের—

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান"

যেন ঐ বৈষ্ণবতত্ত্বেরই কাব্যায়ন। কিন্তু তাহা নহে। বৈষ্ণবতত্ত্ব বৈষ্ণব সাধারণের তত্ত্ব; রবীন্দ্রতত্ত্ব বিশেষভাবে রবীন্দ্রব্যক্তির তত্ত্ব।

কবিধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যদেশের আধুনিক গীতিকবির মত 'অহং'-তন্ত্রী (subjective)। এই 'অহং' বস্তুজগৎকে বিচিত্রভাবে তিরস্-কৃত (refractive) করিয়া অভিনব ভাবজগতে পরিবর্ত্তিত করে—"যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে"। ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবিস্বরূপ। কিন্তু আমার বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় 'ভক্ত'-কবি রবীন্দ্রনাথ যদিও 'ভক্ত' কথাটি পরিচিত অর্থে রবীন্দ্রনাথের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা কঠিন। সুন্দর ভগবান তাঁহার সুন্দর সৃষ্টির সৌন্দর্য্যরস পান করিতেছেন কবির রসনা দিয়া। অসীমের সঙ্গীত অনাহত; কবির 'অহং'-এর বেণুরন্ধ্রপথে তাহা বাহির হইতেছে ধ্বনিত সঙ্গীতরূপে এবং অসীম তাহা শুনিতেছেন সসীম কবির "মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি"। কবি বলিতেছেন,

"অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলি 'আমি'।"

কবির 'অহং' তাঁহার খণ্ডিত মানবসত্তায় অখণ্ড অসীমেরই অহঙ্কার; সুতরাং কবির 'অহং'-দৃষ্টি অসীম 'অহং'-এরই দৃষ্টি। এই 'অহং'-এরই

"চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।…
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।"

বলা বাহুল্য যে, কবির সত্য, দর্শনের সত্য, বিজ্ঞানের সত্য এক নহে। কবির এই 'সত্য'-অবধারণার পশ্চাতে প্রজ্ঞা রহিয়াছে ; কিন্তু এ প্রজ্ঞা দর্শন-বিজ্ঞানের শুদ্ধ প্রজ্ঞা নহে, কবিমানসের ভাবপ্রজ্ঞা। অহং-এর দ্বারা ভাবিত বিশ্বের যে বিচিত্র বর্ণাঢ্য চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বচিত্র নহে, কবির অহং-এরই বিচিত্র রূপায়ণ—

"একে বোলো না তত্ত্ব ;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।"

এই আলোকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কবিরবির

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান"

যে তুমি-আমির লীলার কথা বলিতেছে, তাহা বৈষ্ণবীয় মধুর রসলীলার সহিত একেবারে নিঃসম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে বাঁশী-অভিসার-উৎকণ্ঠ-মিলন-বিরহের আলেখ্য যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় ইহারা বৈষ্ণব-উত্তরাধিকারের স্বাধিকৃত রূপ। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। "রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে" ইত্যাদি কবিতায় বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরসের রূপ অজিতকুমারও দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু একটু অবহিত হইলেই তিনি দেখিতে পাইতেন যে, এখানে ভগবান্ শিশু (সন্তান) নহেন, মাতা এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শে পরিব্যাপ্ত, ইহা বিশ্বসন্তানের জন্য বিশ্বেশ্বর-জননীর পরিবেশিত আনন্দ-অন্ন।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাদৃশ্য বাহ্য ; অন্তস্তত্ত্বে তিনি বৈষ্ণব-অসদৃশ 'রবীন্দ্রনাথ'। বৈষ্ণব মাধুর্যবাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী এবং এই সৌন্দর্যবাদ আবার ঐশ্বর্যবাদে সমাহিত। তাঁহার 'প্রিয়', 'নাথ' প্রভৃতি নায়ক-সম্বোধন নহে, মানসিক অবস্থার (mood) অনুগত 'প্রভু'-সম্বোধন। তাঁহার ভগবান্ রসের নহে, ভাবের। মানুষের ধূলিমলিন মর্ত্য পরিবেশে মানুষের বেশে মানুষের কণ্ঠলগ্ন ভগবান্ রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আঘাত করে।—

"আমিও কি আপন হাতে
করবো ছোট বিশ্বনাথে,
জানাবো আর জানবো তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?"

তাঁহার ভগবান্ রাজা ; তাঁহার বেশও মহার্ঘ, পূজার উপচারও মহার্ঘ। তাঁহার ভগবান্ যেমন ঐশ্বর্যময়, ভাবও তেমনি ঐশ্বর্যময় এবং ভাবের বাহনও পদপরিপাটীতে, ছন্দে, অলঙ্কারে ঐশ্বর্যময়। কবির অসামান্য শিল্পিমনের পরমৈশ্বর্যই সকল ঐশ্বর্যের মূলে। রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণবপ্রভাবও প্রচুর ; কিন্তু সে অন্য দিকে। প্রেমের রাজ্যে নারী-পুরুষের হৃদয়-ধারার সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম স্পন্দনগুলিও আকারিত হইয়াছে পদাবলীকাব্যে। বৈষ্ণব মহাজন

প্রেম-মনস্তত্ত্বের (Psychology of love) সুনিপুণ রূপকার। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তরকালের কবিদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন কথা বলা সত্যই সুকঠিন—নূতন প্রকাশভঙ্গী, নূতন ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও বৈষ্ণবসুরের ফল্গুধারার সন্ধান অনেক স্থলেই পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবকবি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাব্যভিত্তি দার্শনিক তত্ত্বে। শক্তিমান্ শিল্পীর হাতে তত্ত্বও যে রসরূপতা লাভ করিতে পারে রবিকাব্যের মত বৈষ্ণবকাব্যেও তাহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে।

কবি বর্ণশিল্পী। এই বর্ণ কোথাও তুলিকামুখে ফলাইয়া তুলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি, যাহা দর্শকের ভাবলোকে উর্মি তুলিয়া নিবৃত্ত হয়, তরঙ্গ তুলে না; কোথাও আবার লেখনীমুখে স্বল্পরেখায় আভাসিত করে 'খানিক কালো খানিক আলো'-র স্বপ্নচিত্র, যাহা দর্শকমনে যে আনন্দের সৃষ্টি করে, তাহা ধ্যানানন্দ। বৈষ্ণবকাব্যে দুই লক্ষণেরই প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। ব্যঞ্জনার সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ; তাঁহার সমুচ্চ স্তরে বৈষ্ণব কবিও কখনো কখনো উঠিয়াছেন। চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, "তিনি (চণ্ডীদাস) একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দ্বারা লেখাইয়া লন"। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকতা বৈষ্ণবকবির বৈশিষ্ট্য। একজন মর্মজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, "Poetry is the speech of Soul to Soul." কথাটি সুন্দর এবং দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মুখের ভাষা স্থূল, ইহার অর্থ বাচ্য; আত্মার ভাষা সূক্ষ্ম, ইহার অর্থ ব্যঙ্গ্য। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবির ভাষা আত্মার ভাষা। আবার, কবির আত্মা যদি আন্তরিকতার ও তন্ময়তার করোষ্ণস্পর্শে পাঠকের আত্মাকে আনন্দমুগ্ধ করিতে না পারে, কবির সৃষ্টি হয় অকৃতার্থ। এদিকেও বৈষ্ণবকাব্যের কৃতার্থতা। প্রেমধর্মে যাঁহাদের দীক্ষা, তাঁহাদের রচিত পদাবলী প্রিয়তমের পূজাঞ্জলি। বৈষ্ণবকবির প্রেরণা কবিযশঃপ্রার্থনা নহে, নৈবেদ্য-রচনা। কে কত বিচিত্রভাবে পূজার থালী সাজাইতে পারে, কবিদের মধ্যে তাহারই যেন একটা উল্লাসময় প্রতিযোগিতা।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস দুই জনেই পণ্ডিত কবি—রসশাস্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে দুই জনেরই অসামান্য পাণ্ডিত্য। পার্থক্য এইটুকু যে, গোবিন্দদাস রসসম্পর্কে রূপ গোস্বামীর অনুগত এবং বিদ্যাপতি দণ্ডী প্রভৃতির সহিত বাৎস্যায়নেরও অনুগত। দুই জনের প্রকাশ-ভঙ্গী বিভিন্ন—বিদ্যাপতি তরল, গোবিন্দদাস সান্দ্র। বিদ্যাপতির রচনায় যুক্তবর্ণের বাহুল্য, অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার, দীর্ঘ সমাস নাই বলিলেই চলে; গোবিন্দদাস ইহাদের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের রচনাকে কোথাও কোথাও ইহা ভারাক্রান্ত করিয়াছে; কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উদাত্ত-অনুদাত্ত মৃদঙ্গ-ধ্বনিবৈচিত্র্যে বিষয়বস্তুকে তথা ভাববস্তুকে ইহা মহনীয়ই করিয়া তুলিয়াছে—"স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাব-কদম্ব" বা "ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে" ইহার উদাহরণ। "রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি জটিল অলঙ্কারপূর্ণ"-তাকে বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দদাসের কাঠিন্যের কারণরূপে সতীশচন্দ্র নির্দেশ করিয়াছেন। এ নির্দেশ তথ্যসম্মত নহে; কারণ, বিদ্যাপতির রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, শ্লেষ, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত-প্রশংসা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে হয় গোবিন্দদাস অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। তবু বিদ্যাপতির

রচনা অনেক স্থলে ব্যঞ্জনাসত্ত্বেও কতকটা পানীয়; গোবিন্দদাসের চর্ব্বণীয়। বিদ্যাপতির অলঙ্কারমালামণ্ডিত "হাথক দরপণ" পদখানির সহিত গোবিন্দদাসের প্রায়-নিরলঙ্কার "যাঁহা পহু অরুণ-চরণ" পদখানির তুলনায় পড়িলে দেখা যাইবে বিদ্যাপতির রাধা চলিয়াছেন সহজ হৃদয়ধর্ম্মের পথে এবং গোবিন্দদাসের রাধা চলিয়াছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে। দুখানি পদই রসমধুর; কিন্তু প্রথমটির আবেদন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির মস্তিকের মধ্যবর্ত্তিতায় হৃদয়ের কাছে। গোবিন্দদাসের কঠিনতার বহু কারণ আছে। বিদ্যাপতির রস তরুণ, গোবিন্দদাসের প্রৌঢ়। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও দুই জন দুই প্রকৃতির। বিদ্যাপতি ভক্ত নহেন, কবি; গোবিন্দদাস যত বড় কবি, ততোধিক ভক্ত। বিদ্যাপতির রাধায় কোন তত্ত্ব নাই; গোবিন্দদাসের রাধায় গভীরভাবে তাহা বর্তমান। বিদ্যাপতির রাধা উচ্চাঙ্গের নায়িকামাত্র, যদিও পরিমণ্ডলটি বৈষ্ণবীয়। নায়িকারূপে তিনি ভাববিলাসনী, বিদগ্ধা, খরদীপ্তিময়ী। গোবিন্দদাসের রাধা মাধবের "অভিসারক লাগি, দূতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি"; বিদ্যাপতির রাধার পক্ষে ইহা অনাবশ্যক। গোবিন্দদাস চল্লিশের পর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া পরে অর্থাৎ অতিপরিণত বয়সে প্রেমলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, একথা না হয় নাই বলিলাম। গোবিন্দদাস প্রতিভাবান্ কবি। এমন কি যেখানে তিনি অন্য কবির নিকট ঋণী, সেখানেও তাঁহার রচনা মৌলিক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত "যাঁহা পহু" পদখানি রূপ গোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদাবলী' গ্রন্থের

"তদ্বাপীষু পয়ঃ, তদীয়মুকুরে জ্যোতিঃ, তদীয়ালয়-
ব্যোম্নি ব্যোম, তদীয়বর্ত্মনি ধরা, তত্তালবৃন্তে'নিলঃ"

কবিতারই মুক্তানুবাদ। তবু কবি গোবিন্দদাসের নৈপুণ্যে ইহা অভিনব আস্বাদের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, যেমন হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ'-প্রবন্ধে **Watson**-এর **'Autumn'** কবিতার অংশবিশেষের মুক্তানুবাদ।

একজন প্রসিদ্ধ রূপকার কবি জগদানন্দ। ইনি ব্রজবুলি ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। ইহার কাব্যে ভাবগভীরতা তেমন নাই, কিন্তু ভাষার ঝঙ্কার অতুলনীয়। "মঞ্জুবিকচকুসুমপুঞ্জ"-র অপূর্ব সঙ্গীতময় তরঙ্গভঙ্গ জয়দেবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই পদে শ্রবণ-নন্দন অনুপ্রাসের তলে উপমার আলোক দীপ্তি পাইতেছেন সখী-সঙ্গিনী রাধা—ভাবের রাধা নহে, রূপের রাধা। আবার, ভাবের রাধাকে দেখিতেছি "কেন গেলাম যমুনার জলে" পদখানিতে। পূর্ব্বোক্ত গানের ধ্বনি-ঐশ্বর্য্য এই বাঙলা গানখানিতে নাই। অলঙ্কার এখানে অর্থালোকে প্রবেশ করিয়া রাধাহৃদয়ের অভিমুখী হইয়াছে। ব্যঞ্জনার গূঢ় পথে এ হৃদয় অবতরন করিতে না হইলেও ইহা একেবারে ব্যঞ্জনাস্পর্শহীন নহে।

বলরামদাস, জ্ঞানদাস ও বাঙলা এবং ব্রজবুলি দুই ভাষারই পদকর্তা। ইঁহাদের কাব্যসিদ্ধি বাঙলাতেই অধিকতর। দুই জনেই উচ্চশ্রেণীর কবি। ভাবাবেগপ্রবণতা দুইজনেরই কবিধর্ম্ম এবং এই কারণেই ইঁহাদের রচনাধারা স্বচ্ছন্দপ্রবাহ। উভয়ের মধ্যে কাহার আসন উচ্চতর তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অলঙ্কার-প্রয়োগ বলরাম করিয়াছেন বেশী, জ্ঞানদাস কম। তবু বহু ক্ষেত্রেই বলরামের অলঙ্কার বাহ্যভূষণমাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া রসাঙ্গ

হইয়াছে—"তুমি মোর নিধি রাই" পদখানির অলঙ্কার প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারধ্বনি। "হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির" দর্শনদৃষ্টিতে বৈষ্ণবের রাধাতত্ত্ব; কিন্তু এই তত্ত্বকেই কেন্দ্র করিয়া কবি ফুটাইয়াছেন কাব্যকমল, যাহার মর্মকোষে টলটল করিতেছে অনুরাগরূপ বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার-রস। বলরাম রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করিয়াছেন। 'উর্বশী' কবিতার "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল" বলরামেরই "কোথা হৈতে আইলে তুমি" ইত্যাদি অতুলনীয় পদের "মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেখে ও চরণ"-কেই মনে পড়াইয়া দেয়। বলরামের ঐ "তুমি মোর নিধি রাই"-এর কৃষ্ণের পাশে রাখিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে জ্ঞানদাসের নিরাভরণ "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে" এবং সাভরণ "আলো মুঞি কেন গেলু" পদ দুইখানিতে অঙ্কিত অনুরাগময়ী রাধার ব্যঞ্জনামধুর ভাবমূর্তিখানিকে। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর", অথবা

> "রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
> যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
> ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।"

প্রেমের দেশকালজয়ী কাব্যরূপ।

বলরামের "তুমি মোর নিধি"-র ছায়ায় রচিত কবিবল্লভের সুন্দর পদ "কি পুছসি অনুভব মোয়"—উক্তিটি অবশ্য রাধার। কবিবল্লভ শুধু ছায়াটুকু লইয়াই তাহাকে নবতররূপে ঘনীভূত করিয়াছেন। "কি পুছসি"-র প্রায়-সদৃশ পদ গোবিন্দদাসের "আধকি আধ-আধ-দিঠি অঞ্চলে"—আবেগকম্পিত অথচ ব্যঞ্জনামধুর। সতীশচন্দ্রের মতে কবিবল্লভের তুলনায় গোবিন্দদাসের এই পদখানি উৎকৃষ্ট। আমাদের মতে দুটি পদ দুই ভাবে উৎকৃষ্ট; তুলনায় বিচার ঠিক চলে না। 'আধকি আধ'-পদের তাৎপর্য: 'সুনয়নী'-র কাছে কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, রাধার কাছে বিদ্যুতের মত। 'রসবতী'র কাছে কৃষ্ণস্পর্শ স্নিগ্ধরস, রাধার কাছে আগুনের জ্বালা। দুই চক্ষু ভরিয়া যিনি কৃষ্ণকে দেখেন, ধন্য তিনি, তাঁহার চরণে রাধার প্রণাম; রাধার কিন্তু অতি-ঈষৎ অপাঙ্গে কৃষ্ণকে দেখা অবধি 'রহত কি যাত পরাণ'। বস্তুতঃ ইহাই কৃষ্ণপ্রেমিকার জীবন—'রহত কি যাত'। এ প্রেমে বিরুদ্ধের সমাবেশ—কৃষ্ণ শ্যাম মেঘ, আবার বিদ্যুৎ; কৃষ্ণস্পর্শ রসস্নিগ্ধ, আবার জ্বালাময়। অদ্ভুত, বোধাতীত এই প্রেম। রাধা তাহা জানে। 'প্রেম কি লাগি জিউ' ত্যাগ না করিয়া নশ্বর জীবনই তিনি কামনা করেন। এই দুদিনের জীবনে বিষামৃতময় কৃষ্ণপ্রেমের যতটুকু তিনি আস্বাদন করিতে পারেন, তাহাই তিনি করিতে চাহেন। গোবিন্দদাসের এই পদ 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের "জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত ইহারই অনুবাদ—"সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন" মনে পড়াইয়া দেয়। 'কি পুছসি'র মধ্যে—যে রাগ পলে পলে নূতন হইয়া সতত আস্বাদিত (অনুভূত) প্রিয়কে (প্রিয়াকেও) পলকে পলকে নবনবরূপে আস্বাদনীয় করিয়া তুলে, বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের সেই 'অনুরাগে'-র কথা। লক্ষভাবে কৃষ্ণানুভব করিয়াও রাধা অনুভবের সীমা পান নাই—এ পদে রাধা এই কথাই বলিয়াছেন। গোবিন্দদাসের রাধা ও কবিবল্লভের রাধা দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্না, যদিও দুই জনেই অনুরাগময়ী। এ অবস্থায় তুলনায় বিচার কেন? "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে

রাখলুঁ তব হিয়া জুড়ন না গেল"-র মধ্যে সতীশচন্দ্র "শক্তিমান্ ও শক্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনাদি-অনন্ত-কালব্যাপী নিত্য প্রেমসম্বন্ধরূপ বৈষ্ণবদর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ত্ব" দেখিলেন কেন? 'লাখ লাখ' যে 'অনাদি-অনন্ত' অর্থে কবি লিখেন নাই, লিখিয়াছেন 'বহু' অর্থে তাহা পূর্ব্ববর্তী 'জনম অবধি', 'কত মধুযামিনী' ইত্যাদি দেখিলেই বুঝা যায়। পদখানিতে চণ্ডীদাসের "তবু না বুঝিলুঁ কালা তোমার পিরীতি"-র এবং বিদ্যাপতির "তুহু কৈছে মাধব কহ তুহু মোয়"-এর রেশ বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের "কো তুহুঁ বোলবি মোয়" এই সুরে বাঁধা। শশিশেখর "প্রতি দিবস নৌতুনা রাই মৃগীলোচনা"-র রাই-রূপ রাইনিষ্ঠ নহে, কৃষ্ণের রাই-অনুরাগ-নিষ্ঠ। সবচেয়ে মূল্যবান্ গোবিন্দদাসের পদখানির ভণিতা; এ ভণিতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিবল্লভের নাম রহিয়াছে। সতীশচন্দ্র এই যুক্তনামকে কবিবল্লভের শুধু কালনিরূপণের কাজেই লাগাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের কবিবল্লভের প্রতি পরম শ্রদ্ধার ইঙ্গিতটুকু সুবিধামত এড়াইয়া গিয়াছেন। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—রসবতী রাধার রসসীমা জানেন কবি শ্রীবল্লভ ("গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতী-রসমরিযাদ")। 'কি পুছসি'-র সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইহা বৈষ্ণবীয় পদ হইয়াও সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অনুরাগকাব্যে পরিণত হইয়াছে। আর একখানি উৎকৃষ্ট অনুরাগের পদ পরমানন্দ গুপ্ত (কর্ণপূর পরমানন্দ সেন নহেন) রচিত "পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে"। গৌরাঙ্গের প্রতি কবির অনুরাগের এই কবিতাটি ভাবাবেগময়ী, সালঙ্কারা; কিন্তু অলঙ্কার রসকেন্দ্র হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া স্বচ্ছন্দবিকসিত। পদখানি সহজেই অসাধারণের দলে পড়ে।

বলরাম মধুর রসে যেমন, বাৎসল্যরসেও তেমনি সিদ্ধ। "দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে" পদখানিতে অভিমানী শিশু কৃষ্ণের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবশিশু; তাঁহাকে অনুভব করা যায়, ধরা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবের শিশুকৃষ্ণ অসীমের রক্তে-মাংসে-গড়া সীমায়িত রূপ। এ শিশু অমানবীয় হইয়া পড়িলে বৈষ্ণব বাৎসল্য খণ্ডিত হয়। তাই মানবশিশুর স্বভাব পূর্ণমাত্রায় ইহাতে বর্ত্তমান। ঠোঁট ফুলাইয়া কান্নার সহিত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে সাধু সাজিবার চেষ্টা, মাতা যশোমতীর নামে অনুযোগ করিয়া একটু বেশী আদর আদায়ের সুমধুর কৌশল কবির লেখনীমুখে যে অভিনব ভঙ্গীতে ব্যক্তিত হইয়াছে, যে-কোনও যুগের শিশুকাব্য রচয়িতার পক্ষে তা গৌরবের।

বিরহের পদে বিদ্যাপতির "বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা"-র মধ্যে রাধার আর্ত্ত-হৃদয়ের যে ব্যঞ্জনাগূঢ় পরিচয়টি রহিয়াছে, তাহা সত্যই চমৎকার।—এ মালাকে কৃষ্ণ কণ্ঠে রাখিয়া মহিমান্বিতা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচ্যুতা রাধা অর্থহীনা, ধূলিলুণ্ঠিতা মালা; শত পথিক আজ অনায়াসে চলিয়া যাইবে ইহার বুকের উপর দিয়া। তবু শেখরের "কহিও কানুরে সই"-এর কাছে বিদ্যাপতি ম্লান হইয়া গিয়াছেন। রাধার প্রার্থনা "একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে"। আসিয়া তিনি কি দেখিবেন? দেখিবেন রাধারোপিত মল্লিকা, শারীশুক, রঙ্গিনী, হরিণী, শ্রীদামসুবল, যশোমতী···রাধা ছাড়া আর যাহা কিছু সবই। ইহার তাৎপর্য যে বুঝিল, সে ('দূতী') তৎক্ষণাৎ আকুল চিত্তে "চলু মধুপুর"। এবং

পদকর্ত্তা ?—"কি কহব শেখর বচন নাহি ফুর"। চমৎকার। বিদ্যাপতির "চীর চন্দন উর হার ন দেলা"-র ব্যঞ্জনাও সুন্দর ; তবু এক নিঃশ্বাসে 'চীর' 'চন্দন' 'হার' যেন মিলনবাধা ঘটাইবার উপকরণের একটি তালিকায় পরিণত হইয়াছে। কোথায় পড়িয়াছি, "বিরহক ডর উর হার ন দেলা" ;—শুধু 'হার' ব্যঞ্জনাকে যেমন গাঢ় করিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি তাহা করিতে দেয় নাই বলিয়াই মনে করি।

এতক্ষণ আমরা এক একখানি পদকে স্বয়ংপূর্ণ এক একটি কবিতারূপে গ্রহণ করিয়া তাহার কাব্যমূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু গীতিকবিতারূপে ইহাদের পৃথক্ বিচার যেমন চলে, তেমনি গীতিনাট্যরূপেও ইহাদের একপ্রকার সমবেত বিচার চলে। পদকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় হইতে একই রসের বহু পদকে পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া পৃথক্ পৃথক্ 'পালা'-র সৃষ্টি করা হইয়াছে। পালায় পদগুলি এমন কৌশলে পর পর বিন্যস্ত থাকে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদটি রসপুষ্টির জন্য পরবর্ত্তী পদের অপেক্ষা রাখে এবং রস ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে হইতে শেষ পদে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই ভাবের আস্বাদ আরও আনন্দদায়ক। কীর্ত্তনের আসরে এই আস্বাদ আবার আরও বিচিত্র ও গভীর। কীর্ত্তনীয়া একাধারে গায়ক ও অভিনেতা, ভাষ্যকার ও রসপোষ্টা। 'আখরে', 'ঘটকালিতে', 'দশা'য় নূতন নূতন সঞ্চারীর সৃষ্টিও যেমন হয়, মাঝে মাঝে নাটকীয় 'suspense' সৃষ্টিও তেমনি হয়। মুদ্রিত পুস্তকের পালায় এইভাবের আনন্দ সম্ভব নহে ; আবার বিশেষ উদ্দেশ্যের চয়নগ্রন্থে সম্পূর্ণ পালানুক্রমিক পদসজ্জাও সম্ভব নহে। বাঙলার পালাকীর্ত্তন বাঙালীর প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ্ ; অন্যের পক্ষে অনুকরণ অসম্ভব।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

[১]

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। অবশ্য আমরা জয়দেবকে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের দলভুক্ত করিতে চাই না,—তিনি সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত হইলেও অনেক বিষয় ইহা বাঙ্গালা ভাষার কাছাকাছি। জয়দেবের গানে যে সকল ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত অলঙ্কার-সাহিত্যের অনুগামী, সংস্কৃতের নহে। গীতগোবিন্দের ভাষাও অবিমিশ্র সংস্কৃত নহে—উহাতে অনেক প্রাকৃত শব্দ স্থান পাইয়াছে।

আদিযুগের প্রধান কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। কিন্তু বাঙ্গালা পদসংগ্রহে যে পদগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা বাঙ্গালারই মত। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া ইহার বেশ-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—আমরা ইহাকে কতকটা বাঙ্গালীর মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই বেশ-পরিবর্ত্তন কিরূপ, তাহা মিথিলায় প্রাপ্ত পদের সঙ্গে পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদ মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাপতির পদ মহাপ্রভু সর্ব্বদা গাহিতেন। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজকবি ছিলেন, ইনি সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা শিবসিংহ ও তৎপত্নী লছিমাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইনি রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছেন, ভণিতায় তাহার উল্লেখ আছে। ইনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং পর পর অনেক রাজার সহায়তা ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি 'গ্যাসদেব সুলতানে'র প্রশংসাসূচক কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপমা দেশবিশ্রুত;—"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"—প্রভৃতি কত সুন্দর উপমা দিয়াই না তিনি ললনা-চক্ষুর ভাবমুগ্ধ আত্মহারা দৃষ্টি বুঝাইয়াছেন। সেই উপমার প্রত্যেকটি মৌলিক ও কবিত্বময়।

কয়েকটি প্রাচীন পদে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কাহিনী আছে। তাঁহারা পরস্পরের যশে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এই অভিপ্রায়ে 'রূপনারায়ণ'কে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাসও কতকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া শুভ বসন্তঋতুতে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন;—প্রেমের স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রবাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।

চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সহজিয়া ভাবের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহজিয়া মত বহু প্রাচীন। ইহার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন—বৌদ্ধ সমভিস্নায়ীর দল (খ্রীঃ পূঃ তিন শত বৎসর)। 'সমভিস্নায়ী' পালি শব্দ, 'সমভিশ্রায়ী' শব্দের রূপান্তর। বৌদ্ধ বিহারের একদল

সমভাবের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এই সময় হইতেই একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং এ জন্য ভিক্ষু সমাজে তাঁহারা নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। কতকগুলি সহজিয়া পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দুই-চারিটি এত কবিত্বময় ও উচ্চ-ভাবাপন্ন যে, সেগুলি চণ্ডীদাসের প্রতিভার অনুপযুক্ত নহে। তাঁহার রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদেও কোথাও কোথাও সহজিয়া ভাব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। আবার এমন কতকগুলি পদও আছে যাহা হয়ত চণ্ডীদাসের নামে সহজিয়ারা চালাইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবের পদ দেখিয়া অভিজ্ঞ সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের নামে যে পদ প্রচলিত আছে, সেগুলি সব একই চণ্ডীদাসের রচিত নহে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে প্রথম যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আর-একজনের নাম করিব ; ইনি চৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে রাধা-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসের পর সমস্ত পদই তিনি গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিগণের কাকলীতে সাহিত্যের কুঞ্জ মুখরিত। এই সময়ে কত বৈষ্ণব কবির যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। বাসু ঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি কবি এই দলের অগ্রণী। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস শীর্ষস্থানীয়। ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, প্রেম-বিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বহু পুস্তকে গোবিন্দদাসের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতকুলতিলক তৎসাময়িক পণ্ডিতকুল-চক্রবর্ত্তী জীব গোস্বামী সর্ব্বদা গোবিন্দদাসের পদ শুনিতেন, এবং মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ভক্তি-রত্নাকরে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল কবির বিবরণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও কবিওয়ালাদের গানে তাহার কিছু কিছু জের চলিয়াছিল। এই সময়ের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'দিব্যোন্মাদ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

[২]

পদাবলীর রচয়িতাদিগের পরিচয় তাঁহাদের স্বরচিত পদেই পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক পদকর্ত্তা স্বরচিত পদের বা গানের শেষ কলিতে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে মুদ্রাঙ্কিত হওয়াতেই আমরা এত সহজে কবির সন্ধান পাই। পদের শেষে এইরূপ কবির নামসংযোগ করিবার পদ্ধতিকে 'ভণিতা' বলে। প্রায় সকল পদের শেষেই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদের প্রায় সমকালে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতে ভণিতা আছে। তাহার কারণ, আমাদের মনে হয় ঐ কাব্যগুলি পাঁচালীর আকারে পঠিত এবং গীত হইত বলিয়া ভণিতা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে শ্রোতৃ-বর্গের পক্ষে রচয়িতাকে নির্দ্দেশ করা সহজ হইত।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, অধিকাংশ কবিতায় ভণিতা থাকিলেও ভণিতাবিহীন কবিতাও বিরল নহে। কোন ক্ষেত্রে হয়ত কবি নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, এজন্য তিনি স্বীয় নাম যোগ করেন নাই। আবার কোনও কোনও স্থানে হয়ত এমনও হইয়াছে যে, কালক্রমে ভণিতার কলিটি লুপ্ত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, বহু পদের অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। লিপিকরের দোষে অনেক সময়ে এক নামের স্থলে অন্য নাম চলিয়া গিয়াছে, এবং লিপিকরপরম্পরায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে। যে স্থলে এইরূপ কোনও ভুল হয় নাই, সেখানেও অন্য কারণে কখনও কখনও কবি-পরিচয়ে আমাদের বাধা ঘটে। বিদ্যাপতি কখনও কবিশেখর, কখনও কবিকণ্ঠহার, কখনও কবিবল্লভ নামে আপনার ভণিতা দিয়াছেন। অন্য কবিও যে এ সকল ভণিতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, এমন নহে। এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন যে, কোন্ পদটি বিদ্যাপতির এবং কোন্ পদটি অন্য কবির। বিদ্যাপতির নামে পরিচিত বহু পদ গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্ত্তৃক অপরের বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে একাধিক যদুনন্দন, ১০।১১ জন বলরামদাস, ৮ জন গোবিন্দদাস, ২ জন রামানন্দ, ২ জন ঘনশ্যাম এবং ২ জন নরহরি ছিলেন। সুতরাং ভণিতাও সকল সময়ে আমাদিগকে নিঃসংশয়রূপে কবি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না। তাহা হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে ভণিতার বিশেষ মূল্য আছে। এই ভণিতা হইতেই আমরা জানিতে পারি—যাহা অন্য কোনও প্রকারে জানা সম্ভব হইত না—যে, চৈতন্যের পরে বঙ্গে অনেক মহিলা-কবি এবং মুসলমান পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল।

[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পদাবলীর ভাষা আধুনিক কবিতার ভাষা হইতে কতকটা পৃথক্। ভাষার এই পার্থক্যই যে অনেক সময় পাঠকের পক্ষে এই সকল কবিতার অর্থবোধের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ঐছন, পেখলুঁ, ভেল, কহত, ভারত, বহু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার বৈষ্ণব কবিতায় এত অধিক যে, পড়িতে গিয়াই গোলে পড়িতে হয়। এই সকল পদ যখন আমরা কীর্ত্তনীয়ার মুখে শুনিতে পাই, তখন আমাদের তেমন অসুবিধা হয় না; কারণ, কীর্ত্তনীয়া 'অলঙ্কার' বা 'আখর' দিয়া দুর্ব্বোধ বা অপরিচিত শব্দগুলিকে বিশদ করিয়া দেন। উদাহরণ-স্বরূপ যে-কোন পদ লওয়া যাইতে পারে। মনে করুন কীর্ত্তনীয়া গোবিন্দদাসের একটি পদ ধরিয়াছেন:

কো কহ কাম অনঙ্গ।
কেলি-কদম্বমূলে সো রতি-নায়ক
পেখলু নটবর-ভঙ্গ॥

কীর্ত্তনীয়া গাহিবার মুখে বলিলেন, 'কে বলে তার অঙ্গ নাই গো? আমি এই এখনি দেখে

এলাম। রূপ ধ'রে মদন দাঁড়ায়ে আছে। সেই রতি-পতি কেলি-কদম্বের মূলে নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। পরে পদকর্তা বলিতেছেন যে, হাঁ তুমি ঠিকই দেখিয়াছ; তবে সে মদন নহে, 'মদন-মোহন অবতার'।

এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে, তবেই কবিতাগুলির মাধুর্য্য সকলের পক্ষে আস্বাদনযোগ্য হইয়া উঠে। পদাবলীর মধ্যে এই যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, ইহাকে সচরাচর 'ব্রজবুলি' নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে অনুমান করেন—ব্রজবুলি নামক ভাষা মৈথিল ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল। পিঙ্গলের ছন্দোগ্রন্থে ব্রজবুলির মত প্রাকৃতে বিরচিত রাধাকৃষ্ণ পদের নমুনা আছে। অবশ্য পরবর্তী যুগে বিদ্যাপতির পদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে মৈথিল ভাষার অনেকটা প্রভাব ঐরূপ প্রাকৃতের উপর পড়িয়াছিল। গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদ বিদ্যাপতির দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত। মিশ্র ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হওয়ায় সে সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচারে সুবিধা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, সকল প্রদেশের লোকই বৈষ্ণব কবিতা সহজে বুঝিতে পারিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীও ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের কোন কোন রাজা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বীকার করেন। উড়িষ্যার রাজারা প্রায় সকলেই সেই মতাবলম্বী। বৈষ্ণব পদের প্রসার বাড়াইবার জন্য কবিরা হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার বহু শব্দ ও ক্রিয়া ব্রজবুলিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাষার আদি খুঁজিতে গেলে আমরা দেশীয় প্রাকৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিব।

যাহা হউক, মহাজন পদাবলী ব্যতীত অন্য কোথাও আমরা 'ব্রজবুলি'র সাক্ষাৎ পাই না। রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী, এই জন্যই বোধ হয় এই ভাষার নাম ব্রজবুলি (ব্রজের বুলি বা ভাষা) হইয়াছে। বৃন্দাবনেও বাঙ্গালা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে ভাষার সহিত পদাবলী-প্রচলিত 'ব্রজবুলি'র সম্বন্ধ নাই। মৈথিল, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার প্রভাব পদাবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ কবিদিগের ব্যক্তিগত পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিজ নিজ দেশের ভাষা সকলের নিকটই মিষ্ট লাগে। 'দেসিল ব অনা সব জন মিঠ্‌ঠা'। তার পরে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও কম নহে। অনেক মহাজন-পদ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, আবার অনেক পদ সংস্কৃতের অনুকরণে গ্রথিত, যথা :

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

এই সকল কারণে পদাবলী সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পদাবলীর এই দুর্ব্বোধ্যতা দূর করিয়া যাহাতে সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য করা যায়, তজ্জন্য এই পুস্তকে প্রত্যেক পদের নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বত্রই যে আমরা অর্থ ঠিক ধরিতে পারিয়াছি, বা ব্যাখ্যা যথাযোগ্যভাবে দিতে পারিয়াছি, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পদাবলীর মধ্যে এরূপ বহু ভাবসমৃদ্ধ কবিতা আছে, যাহার অর্থ বাহির করা বহু ভাষাতত্ত্ববিৎ ভাবুক ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ।

[৪]

বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা বঙ্গদেশে এক বিপুল কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে যুগে এই সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে গীতি-কবিতার যুগ বলা হয়। এরূপ বিপুল গীতি-কবিতা-ভাণ্ডার আর কোনও দেশের সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। কি অদ্ভুত প্রেরণার ফলে এই পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। যদিও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া কাব্য-সাহিত্যে অমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি পদাবলীর প্রসার ও আদর চৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই বেশী হইয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি বহু কবি সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। অবশ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গীতি-কবিতা-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট্। পদাবলীর রচয়িতৃগণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ভজনের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যেই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই সকল কবিকে 'মহাজন' আখ্যা দেওয়া হয়। সকল কবিই শ্রেষ্ঠ নহেন, সকল কবিতাও মনোজ্ঞ নহে; কিন্তু যে প্রেরণা হইতে ঐ সকল কবিতার উদ্ভব তাহা যে অসাধারণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এই গীতি-কাব্যের প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। দাম্পত্য প্রেম জগতের সমস্ত কাব্যকলার জীবন্ত প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে; তাহার কারণ, রসই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা। যেখানে রস বা আনন্দ নাই, সেখানে কাব্য নাই। দুঃখের অভিব্যক্তিতেও আনন্দ থাকিতে পারে; সুতরাং তাহাও 'রস' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। সুখ-দুঃখ লইয়াই জীবন; সুখ-দুঃখ লইয়াই কবিতা। সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "Poetry is the criticism of life." জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি আছে, ভালবাসা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই অনুরাগ, মিলন, বিরহ, বেদনা লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হইয়াছে। পুত্রের প্রতি মাতার সকরুণ স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, সখার জন্য সখার অসীম ব্যাকুলতা, সখার সঙ্গে সখার নিবিড় সম্মিলন, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রগাঢ় প্রীতি, নায়কের জন্য নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাস্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার—এই লইয়াই যাবতীয় কবিতা। বৈষ্ণব কবিতায়ও এই সকল রসের অনুবৃত্তি ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই, সাধারণ কবিতায় সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম মানুষের মধ্যে নিবদ্ধ; বৈষ্ণব কবিতায় উহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে যে ভাবে সেই লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, মানুষ যদি এ কবিতার অবলম্বন হইত, তাহা হইলে ঐ রসগুলি এ প্রকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইত কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীদাম প্রভৃতি সখা সখ্য-রসের প্রতীক। 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সমপ্রাণঃ সখা মতঃ'। সখা হইতে হয়ত এমনই হওয়া উচিত। যশোমতী বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী; বাৎসল্য হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে কিছুই থাকে না। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপ; তাঁহার জীবনের সবখানিই সেই প্রীতির মাধুর্য্যে ভরপুর।

অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণ যদি ভগবৎপদ-বাচ্য হয়েন, তবে তাঁহাদিগকে দিয়া সাধারণ মানুষের মত লীলাখেলা না করাইলেই ভাল হইত। এ স্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, বৈষ্ণবরা ভগবান্‌কে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া আমাদের জীবনে সুখ-দুঃখের পরপারে নির্ব্বাসন করিয়া দেন নাই—ইংরেজ কবি যাহাকে বলিয়াছেন "Too far from the sphere of our sorrow." শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কথিত হইলেও তিনি যে জীবের একান্ত আপনার, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যে মানুষের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আরও অনেক ধর্ম্মমতে ভগবানের সহিত মানব নিকট-সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা করিয়াছে। খৃষ্টানেরা ভগবান্‌কে পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করেন, শৈবেরাও উপাস্য দেবতাকে ঐরূপভাবে সম্বোধন করেন, শাক্তেরা ইষ্টদেবতাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। ভগবান্‌কে একবার আপনার জন বলিয়া মনে করিলে সখা, পুত্র, প্রাণপতি, কিছুই বলিতে আর দ্বিধা হয় না। রামপ্রসাদ যে মুহূর্ত্তে ভগবান্‌কে 'মা' বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখনই তাঁহার কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। তিনি কখনও তাঁহার সহিত খেলা করিতেছেন, কখনও কোন্দল করিতেছেন, কখনও তাঁহার নিকট আব্‌দার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যও যখন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা-ব্যথার মধ্যে ভগবান্‌কে পাইলেন, তখন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত রূপ আর রহিল না। হৃদয়-দেবতাকে লইয়া তখন কাব্যকলার সমস্ত বিলাসই সম্ভবপর হইল।

'পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ'—পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ, তাহার সাধারণ নাম ভক্তি। কিন্তু এখানে ঈশ্বরে যে পরানুরক্তি বা প্রগাঢ় প্রেম, যে প্রেমসকল ভুলাইয়া নেয়, যে প্রেমে ভেদবুদ্ধি থাকে না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলাইয়া দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহাই ভক্তি। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। এই পরানুরক্তি বা প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার সবগুলি ঝরণার ধারা ছুটাইয়া দিয়াছে। ইহাই পদ-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহাই কাব্য-জগতে নতুন প্রেরণা আনয়ন করিল। ইহারই জন্য বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্য চির-নবীন; বহুবার শুনিলেও ইহা পুরাতন হয় না। রস-সম্পদেও এই জন্য ইহা গরিষ্ঠ। একজন সুধী সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, "ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শত শত পদ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের ঝঙ্কার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যে দিক্ দিয়া বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কম আছে।"*

পদাবলী গীতি-কবিতার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে। এগুলি প্যাল্‌গ্রেভের Golden Treasury কবিতার মত খণ্ড কবিতা নহে, বরং ইহাদিগকে খণ্ডকাব্য বলা যাইতে পারে। লীলার বৈচিত্র্য অনুসারে কতকগুলি কবিতা গোষ্ঠ, কতকগুলি বিরহ, কতকগুলি মান—এইভাবে গ্রথিত হইতে পারে। কোন্ কবিতা কোন্ রসের বা কোন্ পর্য্যায়ের অন্তর্গত তাহা সেই কবিতা দেখিলেই বুঝা যায়। বহু কবি

* সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ., 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকা'।

'মান'-সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির মধ্য হইতে পদ বাছিয়া সাজাইলেই সুন্দর একখানি খণ্ডকাব্য হইতে পারে। কীর্ত্তনীয়াগণ এইরূপভাবে পদ বাছিয়া 'পালা' সাজাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান চয়নে সেরূপ রীতি সম্যক অবলম্বিত হয় নাই। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি সংকলন-গ্রন্থের উদ্দেশ্য লইয়া যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রথিত হয় নাই, ইহা অভিজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব কবিতার আস্বাদন সকলে যাহাতে স্বল্পপরিসরে পাইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

[৫]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে এবং কাব্য-সাহিত্যে যে অপূর্ব্ব প্রেরণা আনয়ন করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী, সর্ব্বসুখলালসাবর্জ্জিত চৈতন্যদেব প্রেমের এক নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। পার্থিব, প্রাকৃত প্রেমের সম্পর্ক লেশমাত্র পরিহার করিয়া তিনি এক অপ্রাকৃত স্বর্গীয় প্রেম-রাজ্যের সন্ধান জগতে প্রচার করিলেন।

মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

এই পদটিতে বাসু ঘোষের ভণিতা আছে; কখনও কখনও নরহরি সরকার ঠাকুরের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই মহাপ্রভুর সমসাময়িক; সুতরাং তাঁহাদের চাক্ষুষ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেমমাধুর্য্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি না হইলে ব্রজরমণীগণের নিঃস্বার্থ ভক্তি বা প্রেমের কথা জানাইতে কাহার শক্তি ছিল? রক্ত-মাংসের সংস্রবহীন যে প্রেম, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

দেহের তৃপ্তির সম্বন্ধ যেখানে আছে, সেখানে প্রেম হয় না। সর্ব্বপ্রকারে দেহের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত হইয়া চৈতন্যদেব স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। তাহারই অভিব্যক্তি কাব্যের শ্রীরাধা। শ্রীরাধা প্রেমিকা, কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞানহারা, উন্মত্তা। কিন্তু শ্রীরাধা কে? ভগবানেরই প্রেম-রসমূর্ত্তি, তাঁহারই হ্লাদিনী শক্তি। ভগবানের শক্তিতে জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়; কিন্তু ভগবানের অনন্ত শক্তি ত ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রসস্বরূপ, আনন্দময়, 'পিরীতি রসের সার'। তিনি যেমন আপনার চিৎ-শক্তির দ্বারা আপনার তত্ত্ব আপনি অবগত হয়েন, তেমনি প্রেমস্বরূপ বা হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আপনাকে আপনি আস্বাদন করেন। সুতরাং কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে রসিকশেখর বা রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি এবং রাধিকাকে সর্ব্ব রূপ-গুণের আধার নায়িকাগণের শিরোমণি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

[৬]

চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের পদাবলী দিনরাত আস্বাদন করিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সদর দরজা বন্ধ করিয়া সারারাত্রি গান চলিত। পুরীতে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গোবিন্দের সঙ্গে চৈতন্য কত রাত্রি নাচিয়া গাহিয়া কাটাইয়া দিতেন, তথায় অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে তিনি নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইতেন তখন নাম-কীর্ত্তন চলিত।

অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত কত ছন্দোবন্ধে রাধাকৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন করিতেন ; ক্রমে সেই রসে বিভোর হইয়া তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে রাধার বিরহব্যথা জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উজ্জ্বল দেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ করাইয়া দিত। এই রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত নবীন সন্ন্যাসী প্রেমের বন্যায় সারা বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সেই প্রেমসিন্ধু হইতেই পদাবলীরূপ কৌস্তভমণির উদ্ভব।

গোবিন্দদাস, বলরামদাস এবং আধুনিক কালে কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কবির রাধাকৃষ্ণের লীলা গৌর-প্রেম-রসপুষ্ট। যে 'দিব্যোন্মাদ' গাহিয়া কৃষ্ণকমল পূর্ব্ববঙ্গ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতেরই সারাংশ। এই প্রেমোন্মাদনা পুরীর গম্ভীরায় সর্ব্বদা প্রকাশিত হইত। অনেক বৈষ্ণব পদে কবিরা চৈতন্যদেবকে আঁকিয়া তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তিকে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের প্রতীক করিয়া দেখাইয়াছেন। একদিকে গৌরচন্দ্রিকা, অপর দিকে গৌরের শীলমোহর করা রাধাকৃষ্ণের পদ। এই দিকে গৌরলীলা স্মরণ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর গাহিলেন :

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ-চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥

অপর দিকে রাধামোহনের বহু পূর্ব্বে চণ্ডীদাস গৌরলীলার আগমনী হৃদয়ঙ্গম করিয়া গাহিয়াছিলেন :

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়॥

চৈতন্যের পরবর্তী রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ত কথাই নাই, কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাসের কবিতায়ও তাঁহার আসন্ন লীলার পূর্বাভাস পড়িয়াছিল :

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায় ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ধুলায় লুটায়॥

চণ্ডীদাস তাঁহাকে দেখেন নাই—জগতে একমাত্র চৈতন্যই হরিনাম শুনিলে সকলের পায়ে গড়াগড়ি যাইতেন। চণ্ডীদাসের রাধা এখানে গৌরলীলার পূর্বাভাস। কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবীর কিংবা কর্ম্মবীরের আগমনের পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সেই ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীরের আগমনী গান করেন, ভাবী ঘটনা তাঁহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। এইভাবে রুসো ও ভল্টেয়ার নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের পূর্ব্ব-সূচনা করিয়াছিলেন এবং চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার লীলার সুর সুমধুর সঙ্গীতে বহিয়া আনিয়াছিলেন। যখন বিদ্যাপতি বিসপী গ্রামে বসিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণন করিতেছিলেন—যখন লিখিতেছিলেন, "থীর নয়ন অথির কি ভেল" কিংবা "আধ আচর খসি, আধ বদনে হসি, আধহি নয়ান তরঙ্গ।"—তখন নানুরের কবি পূর্ব্বরাগের যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনাবেগের প্রসঙ্গ নাই। তাহা ক্লিষ্ট-কর্ম্মা তপস্বীর,—"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো"—যে রাধিকা নীলাম্বর পরিয়া কৃষ্ণের বর্ণ-সাদৃশ্য অনুভব করেন, এ রাধা সে রাধা নহে :

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

রাধা উপবাস করেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরেন। বস্তুতঃ বেণু-বীণার সঙ্গীতমুখর—নানা রাগালাপনে বিচিত্র—পার্থিব কাহিনীর চিহ্ন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগে বেশী পাওয়া যায় না। যতই গভীরভাবে তাহার গূঢ়ার্থের বিচার করা যাইবে ততই দেখা যাইবে, এখানে অনুরাগের নামে ঘোর বিরাগ, সংযোগের নামে পার্থিব সুখ-ভোগের সম্পূর্ণ বিয়োগ। প্রেমময়ের বাঁশীর সুর শুনিলে ঘর আর ঘর থাকে না। তখন সংসারের সাধ্য কি তাহাকে কর্ত্তব্যের বাঁধন দিয়া ঘরে আটকাইয়া রাখিবে? চণ্ডীদাসের কবিতায় সর্ব্বত্র সেই বৈরাগ্যের সুরটি শুনিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের বহু পদে একান্তভাবে প্রেমাস্পদের চরণে আত্মসমর্পণের কথা আছে; যথা, "কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া।" তিল তুলসী দিয়া—অর্থাৎ সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া—তাঁহার অনুরাগে দেহ সমর্পণ। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদেও এই সুরটি পাওয়া যায় :

দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

বলিতেছেন—আমার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তোমার সেবায় চিরতরে নিযুক্ত করিব—সংসারে দাবী-দাওয়া আমার উপর আর রহিল না, আমি একেবারে তোমারই হইলাম।

সমস্ত বৈষ্ণব পদেই এই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষবরের বাঁশীর সুর ধ্বনিত হইতেছে। কীর্ত্তনগানের গৌরচন্দ্রিকা শ্রোতার লক্ষ্য সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া অধ্যাত্ম-রাজ্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

[৭]

বৈষ্ণব কবিদিগের অধ্যাত্মভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের আর একটি দিক্ আছে—তাহা কবিত্বের দিক্। বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য্য, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ কূজিত জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্য্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য। বিদ্যাপতি রাধার মুখে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা—তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই—মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, জল হইতে তুলিলে সে তখনই মরিয়া যায়—আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু "মাধব তুহু কৈছে কহবি মোয়"—আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়—মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন!

রাধা কাহাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াছেন?—সর্ব্বস্ব দিয়া শেষে পরিচয় জিজ্ঞাসা,—এ মন্দ নয়! প্রেমিক এত তপস্যার পর বুঝিতেছেন—যাঁহাকে তিনি আপন হইতে আপন মনে করিয়াছিলেন, তিনি পরাৎপর, অবাঙমনসগোচর। বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জানা পথ দিয়া লইয়া যাইয়া অ-জানার সন্ধান দেয়।

এই ভাবের পদ চণ্ডীদাসেরও আছে। রাধিকা পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার জনকে পর করিয়াছেন; ঘরে মন নাই, ঘর বাহিরের মত হইয়া গিয়াছে—আর বাহিরে অভিসারে যাইয়া যেন আসল ঘর পাইয়াছেন। সারারাত্রি জাগেন—এবং দিনের বেলায় ঘুমে এলাইয়া পড়েন—"রাতি কৈলাস দিবস, দিবস কৈলাস রাতি", কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি এই সর্ব্বস্বত্যাগী প্রেমসাধনা করিলেন, যে প্রেমে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় করিয়া অসাধ্য-সাধন করিলেন, সেই পুরুষবরকে ত মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার জন বলিয়া মনে করিতে সাহস করেন নাই। এত করিয়াও "বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।" এত ভালবাসা দিয়াও সর্ব্বদা

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে॥

বৈষ্ণব কবিতা এই সসীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে। সসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের সার কবিত্ব; এবং হঠাৎ সেই কবিতার সুর বদলাইয়া যায়, আসল পাওয়া জিনিস হারাইয়া যায় এবং সমস্ত বিষয়টা—যাহা পরিষ্কার বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা—জটিল এবং অস্পষ্ট প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও আলিঙ্গনের স্পৃহা মিটে না, শত শত বাসন্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জন্ম ভরিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষ্ণা মিটে না। এ কি অফুরন্ত রহস্য। এই অপার আনন্দের পর-পার দেখা যায় না।

রাধার তপস্যা যোগীর তপস্যা,—সারারাত্রি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিছল পথে যাতায়াত শিক্ষা করেন, প্রিয় যখন ডাকিবেন, তখন সে দুর্গম পথে যাইতে হইবে,—পথে কাঁটা বিছাইয়া দুই চক্ষু বুজিয়া তিনি সারারাত্রি পথ হাঁটেন, অমাবস্যা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপথে তাঁহাকে বাঁশীর সুর শুনিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া যে ছুটিতে হইবে! এই সকল পদে পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিবের মিলন, বিয়োগান্ত নাট্যের সমস্ত কারুণ্য অথচ তাহা সিঁড়ির পর সিঁড়ির ন্যায় প্রেমের উচ্চ স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

আমরা 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা'য় পার্থিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি। ভালবাসার জন্য মানুষ যত কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে পারে, পল্লী কবিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। প্রসাদ-স্বামী কুটিরবাসিনীর পায়ে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছেন; কুটিরবাসিনী তাহার প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ উত্তাল নদী-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়া দিয়াছে। কত বিরহীর অশ্রু, মনস্তাপ ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমর্পণ ও হত্যা, কত প্রেমিকের শ্বেতাব্জসুন্দর নির্ম্মলতা, কত বীরোচিত ধৈর্য্য ও মূর্ত্ত সহিষ্ণুতা পল্লী-গীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহা লক্ষ্যের অতীত সেই মহাসত্যকে অবলম্বন করিয়াছে। কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি—এক কথায়, যে-কোন কালে যে-কোন নায়িকা প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন,—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক। রাধার পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ও ভাব-সম্মিলনের পরে প্রেমের কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবি যে সত্য, চৈতন্যদেব তাহারই প্রমাণ। 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা'য় নায়িকাদিগকে প্রেমের যে উত্তুঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা হইতে বৈষ্ণব কবির বৈকুণ্ঠ আরও দূরে,—মনে হয়, গীতিকার নায়িকাদের আর এক-এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্ডী সুরু হইয়াছে। শত শত সতী যে চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হব্য-স্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয়, তখন তাহার নাম হয় 'রাধা-ভাব'।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

শুধু বাঙ্গালার নয় আধুনিক ভারতীয় আর্য সব ভাষারই পুরানো সাহিত্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের গীতগুলি লইয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর আরম্ভ। বৈষ্ণব পদাবলী নামটি আধুনিক কালে দেওয়া। তবে পদাবলীর নামকরণ জয়দেবই করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-বিরহ-ভাবনায় যখন অস্থির হইয়া পড়িতেন তখন জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গান শুনিলে ধৈর্য মানিতেন। এই হইতে বৈষ্ণব সমাজে পদাবলীর সমাদর এবং বৈষ্ণবসাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচনার ও গানের রীতিমত অনুশীলন চলিতে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলী নামটিও এখন হইতে সার্থক হইল।

বৈষ্ণব-পদাবলী-রচয়িতারা তাঁহাদের পূর্বজ ও প্রাচীন পদাবলী-রচয়িতাদের 'মহাজন' (অর্থাৎ উত্তরসাধক মহাপুরুষ) বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতেন। যাঁহারা পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা যে-সব প্রাচীন রচনায় কবির স্বাক্ষর পান নাই এবং অন্য সূত্রেও কবির নাম জানিতে পারেন নাই তখন 'মহাজনস্য' বলিয়া সেই পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সূত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর নামান্তর মহাজন-পদাবলী। জগবন্ধু ভদ্র যিনি আধুনিক কালে প্রথম পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি 'মহাজন-পদাবলী' নাম দিয়াই দুই খণ্ডে বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছিলেন। পদ যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারাও পরবর্তীকালে মহাজনরূপে গণ্য হইয়াছেন। এইজন্য পদ গাহিতে গাহিতে শেষে ভণিতা উচ্চারণ করিবার সময় কীর্তনীয়ারা করজোড়ে নমস্কার করিয়া পদকর্তা-মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পদের শেষে দুই ছত্রের মধ্যে কবির নাম সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহাকে বলে 'ভণিতা'। জয়দেবের গানে স্বাক্ষরছত্রে প্রায়ই 'ভণতি', 'ভণিতম্' ইত্যাদি পদ আছে। বৈষ্ণব পদকর্তারাও প্রায়ই 'ভণে', 'ভণই' ইত্যাদি পদ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে পদসংগ্রহকর্তারা পদমধ্যে কবির স্বাক্ষরযুক্ত ছত্রদ্বয়ে 'ভণিতা' শব্দটি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

পদাবলীর নামের মত রূপও জয়দেবের দেওয়া। জয়দেবের গানে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতেও তেমনি সাধারণতঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় ছত্রদ্বয় (জয়দেবে কখনও কখনও শুধু তৃতীয় ছত্র) 'ধ্রুবপদ' বা 'ধুয়া'। প্রত্যেক দুই ছত্র গাওয়া হইলে পর ধ্রুবপদ গাহিতে হইত। ধ্রুবপদ বাদে জয়দেবের অধিকাংশ পদে ছত্রসংখ্যা ষোল, একটি পদে দশ, একটি পদে নয়, বাকি পদটিতে বাইশ। বৈষ্ণব পদাবলীতে ছত্রসংখ্যা সাধারণতঃ বারো কিংবা চৌদ্দ, দৈবাৎ ষোল ও দশ। দশের কম ছত্র নাই বলিতে হয়। শেষ দুই ছত্রে কবির নাম।

সেই সঙ্গে ঈশ্বরের অথবা গুরুর কিংবা গুরুস্থানীয়ের নামও থাকিতে পারে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে তাহার পোষ্টা রাজার ও রাণীর অথবা অপর কোন সুহৃদের নাম পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতির মত ভণিতা শুধু একজন কবি, গোবিন্দদাস কবিরাজ, দিয়াছেন। শেষ ছত্রে দীনতাজ্ঞাপন অথবা আত্মকল্যাণ কিংবা শ্রোতৃকল্যাণ কিংবা কামনা জয়দেবে আছে, বৈষ্ণব পদাবলীতে বেশী করিয়া আছে।

জয়দেবের পদাবলীর বিষয় রাধাকৃষ্ণের মান ও মানভঞ্জন-লীলা। বৈষ্ণব কবিতার বিষয় প্রধানতঃ ব্রজে কৃষ্ণলীলা। তাহার মধ্যে মুখ্য রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র প্রণয়লীলা। কৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলা অনেকটা গৌণ। চৈতন্যলীলাও বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়ীভূত। তবে বিশেষ করিয়া চৈতন্যের বাল্যলীলা ও সন্ন্যাস বৈষ্ণব কবিদের উদ্দীপিত করিয়াছিল। প্রধান বিষয়ীভূত না হইয়াও চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর (ষোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয় পদ হইতে) আদ্যন্ত জুড়িয়া আছেন। বাংলা রসময় পদাবলীর কথা ছাড়িয়া দিলে বৈষ্ণব পদাবলীর পট একটি মাত্র মূর্তির দ্বারা অধিকৃত। সে মূর্তি বিরহিণী রাধার। কৃষ্ণবিরহবিধুর চৈতন্যের আদলে এ মূর্তি আঁকা। বিরহিণী রাধার ছবি চৈতন্যের বিরহমূর্তি দেখার আগেও বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি আঁকিয়াছিলেন, আরও আগেকার কবিদের তো কথাই নাই। কিন্তু যাঁহারা মহাভাবমিশ্রিত চৈতন্যকে দেখিয়া অথবা তাঁহার কথা শুনিয়া ও অনুভব রাখিয়া রাধার ছবি আঁকিয়াছিলেন তাঁহাদের রঙে রেখায় এমন একটি ভক্তিনম্র গভীর ব্যাকুলতা আছে যাহা বৈষ্ণব পদাবলীকে মহীয়ান্ করিয়াছে। দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি। দুইটিই ষোড়শ শতাব্দের রচনা। প্রথমটি প্রথম পাদে লেখা, দ্বিতীয়টি চতুর্থ পাদে।

নিম্নোদ্ধৃত পদটি মুরারিগুপ্তের প্রথম জীবনের রচনা। তিনি চৈতন্যের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। প্রথম জীবনে চৈতন্য তাঁহার সঙ্গে বয়স্যবৎ আচরণ করিতেন। মুরারি চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার ভাবিতেন। কিন্তু গানটি যখন লিখেন তখন চৈতন্যের বিরহদশা ঘটিতে বিলম্ব ছিল। মুরারির এই পদটি খুব উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে না ফেলিলে দোষ হয় না। রাধা কেন, যে-কোন দুরূহ-প্রেমক্লিষ্ট নায়িকার উক্তি বলিয়া নেওয়া চলে।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বোঝাও ॥ধ্রু॥
নয়ন-পুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥

খাইতে শুইতে বৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

দ্বিতীয় পদটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। পদটি রাধার প্রেমব্যাকুলতা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন-রূপে বর্ণিত। এ পদ বৈষ্ণব পদাবলীর বাহিরে ফেলা অসম্ভব। শুধু 'ব্রজবিহারী', 'বংশীধারী', 'শ্যাম রায়', 'রাধাকান্ত' ও 'গোপনারী' আছে বলিয়াই নয়, সমস্ত পদটির মধ্যে যে দীন আর্তি ফুটিয়া উঠিয়া শেষ ছত্রে যে নিখুঁত নিটোল অনুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সত্যতার প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যে।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদিমন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তপ ভরসা॥ ধ্রু॥
সম-শৈল কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপিণী গুণহীনী গোপনারী।
তুমি জগজন রঞ্জন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রসপণ্ডিত রস-চূড়ামণি॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর চিতে আন নাহি ভায়॥

চৈতন্যের পূর্বে (জয়দেব ছাড়া) অথবা চৈতন্যের সমকালে বৈষ্ণব পদাবলী আখ্যান অনুসরণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে রচিত হইত না অথবা পালাবন্দিভাবে গাওয়াও হইত না। তখন সাধারণ গানের মত ছুটকোভাবে গাওয়া হইত। লীলানুসারে ধারাবাহিক পদরচনা শুরু হইল চৈতন্যের তিরোধানের বেশ কিছুকাল পরে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমলীলা জয়দেবের আগে আদিরসাপ্লুত ছিল। সে রস গীতগোবিন্দে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত না হইলেও ভক্তিরসের ছিটাফোটা তাহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। জয়দেবের পরে যাঁহারা গান লিখিলেন তাঁহারা রসের দিক দিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্দিষ্ট পথ ধরিলেন। এই পথ জয়দেবই নির্দেশ করিয়াছিলেন। ভদ্র সাহিত্যের বাহিরে রাধাকৃষ্ণলীলাকাহিনী সম্পূর্ণভাবে আদিরসের গাঢ়তা ত্যাগ করিতে পারে নাই। চৈতন্যের সময় হইতে বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবধর্মের মধুররসের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসের) মর্যাদা সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কৃষ্ণলীলার প্রেমকাহিনীকে সেই অনুসারে গড়িয়া লইতে হইল। এই কাজ করিলেন রূপ গোস্বামী। তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জ্বলনীলমণি' বই দুইটি

লিখিয়া ব্রজলীলার সরণি বাঁধিয়া দিলেন। লীলার দুই ভাগ হইল—ব্রজলীলা ও নিত্যলীলা। ব্রজলীলায় ভাগবতপুরাণে বর্ণিত অবতার কৃষ্ণ ও বলরামের সমস্ত ঘটনা। কংসের কারাগারে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকায় বিহার পর্যন্ত। তাহার মধ্যেও ব্রজলীলাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হইল। যশোদার ঘরে আসার পর হইতে অক্রূরের সঙ্গে মথুরাযাত্রা পর্যন্ত যে সব লীলা তিনি করিয়াছিলেন সেগুলিকে ভগবানের অবতারের কাজ বলা চলে না। কেন-না ব্রজলীলা ভূভার······জন্য হয় নাই, ধর্মসংরক্ষণের জন্যও নয়। সে শুধু নিজের বিলাস। তাই রূপ গোস্বামী ব্রজলীলাকারী কৃষ্ণকে অবতারের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া বলিলেন 'অবতারী', যিনি অবতার নহেন, যিনি নিজের অংশকলাকে অবতীর্ণ করান। রাম, বলরাম ইত্যাদি অবতার, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ'। কিন্তু কৃষ্ণ অবতার নহেন। তিনি অবতারী, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

কৃষ্ণের ব্রজলীলা নৈমিত্তিক বিলাস। তিনি দ্বাপরযুগে এক বিশেষ সময়ে এই লীলা করিয়াছিলেন। গোলোকে তাঁহার নিত্যলীলা। সে লীলা ব্রজলীলারই মত তবে নিত্যধামে কৃষ্ণ চিরকিশোর—তাই সেখানে তাহার শিশুলীলা নাই।

ব্রজলীলার বিষয় পূর্বাগত। রূপ গোস্বামী কেবল ভদ্ররুচিবিগর্হিত ঘটনা ও ভাব বাদ দিলেন। আর তিনি যে নিত্যলীলার উদ্দেশ দিলেন সে অনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃতে 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্য লিখিয়া গোলোকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহর লীলা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বৈষ্ণব কবিরা রূপ গোস্বামী অনুসরণে ব্রজলীলা এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুসরণে নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়া পদাবলী রচনা করিতে লাগিলেন। নিত্যলীলা লইয়া রচিত পদাবলীর বিশেষ নাম 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'। 'অষ্টপ্রহর' অথবা 'চব্বিশ প্রহর' সংকীর্তন অনুষ্ঠানে দণ্ডাত্মিক-পদাবলী গাওয়া হইত।

রূপ গোস্বামী যে ব্রজলীলার দাঁড়া বাঁধিয়া দিলেন তাহার অতিরিক্ত কিছু কিছু নূতন কাহিনী পরে পদকর্তাদের দ্বারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন সুবলমিলন, কলঙ্কভঞ্জন, 'রাই রাজা' ইত্যাদি।

পদাবলী-কীর্তন পদ্ধতি যাহা এখন অবধি চলিতেছে তাহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন নরোত্তম দাস। তাহার আগে পদাবলী সাধারণতঃ পালাবন্দিভাবে গাওয়া হইত না। হইলেও তাহা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে পরিগণিত ছিল না। জয়দেবের সময় হইতে পদাবলী গানের যে রীতি মিথিলায়ও বাঙ্গালার চলিত ছিল তাহারাই আধারে নরোত্তম পদাবলী-কীর্তনের ঠাট বাঁধিয়া দিলেন। এই ঠাটের অপরিহার্য অঙ্গ হইল মৃদঙ্গ বাদ্য। কয়েকটি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে নরোত্তম পদাবলী-কীর্তনে বড় আসর করিয়াছিলেন। সেই আসরে খোল বাজাইয়াছিলেন দেবীদাস। নরোত্তমের সঙ্গে ইঁহারও কৃতিত্ব স্মরণীয়। নরোত্তমের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পদাবলী-কীর্তন শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই। তবে ষোড়শ শতাব্দ শেষ হইবার পূর্ব হইতে শ্রীখণ্ড কীর্তন গানের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের বিশিষ্ট পদকর্তারা শ্রীখণ্ড অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। এই অঞ্চলেই কীর্তনগান সর্বাধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দে পদাবলী-কীর্তনের তিন-চারিটি রীতি দেখা গিয়াছিল। প্রাচীন রীতি নরোত্তমের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া তাঁহার ও তাঁহার সুহৃদ্ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল। নরোত্তমের তিরোধানের পর এই প্রাচীন রীতি বিশেষভাবে অনুশীলিত হইতে থাকে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজসভার পোষকতায়। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের কীর্তন-পদ্ধতি একটু অন্য রকম ধাঁচের হইয়া পড়ে। নরোত্তমের প্রবর্তিত কীর্তন-পদ্ধতির নাম হয় 'গরাণহাটী'। অনেকে মনে করেন যে, এই নাম নরোত্তমের নিবাস খেতরীগ্রামের পরগণার নামের ('গড়ের হাট') বিকৃত রূপ। বিষ্ণুপুরে কীর্তন-গান যে ঠাট লইয়াছিল তাহার নাম হইল 'ঝাড়খণ্ডী'। বিষ্ণুপুর তখন ঝাড়িখণ্ড ('ঝারিখণ্ড') প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীখণ্ড, কাটোয়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলে নিত্যানন্দের ও তাঁহার বংশীয়ের শিষ্য-প্রশিষ্যরা কীর্তন-গানের যে রীতি খাড়া করিয়াছিলেন তাহাতে দেশী গানের ঢঙ খানিকটা মিশিয়াছিল। এই রীতির নাম 'মনোহরশাহী'। এই নামের পরগণায় বহু বিশিষ্ট পদ-কর্তা ও কীর্তন-গায়ক উদ্ভূত হইয়াছিলেন। মনোহরশাহী-কীর্তনের কেন্দ্র হইয়াছিল শ্রীখণ্ড।

আরও একটি কীর্তনগান-পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। নাম 'রেনিটি', রাণীহাট পরগণার নাম হইতে উৎপন্ন। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে এই পরগণা। হয়ত কুলীনগ্রাম এই পদ্ধতির উৎপত্তিস্থল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদি পীঠস্থান কুলীনগ্রাম। চৈতন্যের জন্মের পূর্বে এখানে মালাধর বসু ও হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্যে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

পালাবন্দি কীর্তন-গানের আসরে প্রথমেই চৈতন্য-বিষয়ক পদ গাহিতে হয়। এই গানের নাম 'গৌরচন্দ্রিকা'। পালার বিষয় ও বিশিষ্ট রসের সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার মিল থাকা আবশ্যক। যেমন বাসন্তী রাসলীলার একটি গৌরচন্দ্রিকা ('তদুচিত গৌরচন্দ্র')।

মধু ঋতু যামিনি সুরধুনি-তীর।
উজর সুধাকর মলয়-সমীর॥
সহচর-সঙ্গে গৌর নটরাজ।
ফীরয়ে নিরুপম কীর্তন-মাঝ॥ ধ্রু॥
খোল-করতাল-ধ্বনি নটন-হিলোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ।
নাচত গাওত কতভঙ্গ-বিভঙ্গ॥
কোকিল-মধুকর পঞ্চম ভাষ।
নয়নানন্দক-পহু করয়ে বিলাস॥

সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে পদাবলী-সঙ্কলন শুরু হয়। এই কাজ ঊনবিংশ শতাব্দের উপক্রম পর্যন্ত চলিতে থাকে। পদাবলী-সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে চারিখানি সবিশেষ মূল্যবান্। প্রথম গ্রন্থ রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' সপ্তদশ শতাব্দের সপ্তম দশকে

সঙ্কলিত হইয়াছিল। বইটি এখনও ছাপা হয় নাই। রামগোপালের জন্ম পদকর্তা ও কীর্তনীয়ার বংশে। নিজেও পদকর্তা এবং সম্ভবতঃ কীর্তনীয়া ছিলেন। রামগোপাল শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন বংশীয়ের শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি' যাঁহার সঙ্কলন তিনি একজন বড় পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-সাধক ছিলেন। নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে সঙ্কলিত হইয়াছিল আনুমানিক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে। বিশ্বনাথ নিজেও পদকর্তা ছিলেন। বিশ্বনাথের বইখানি সংকল্পিত সংকলনের প্রথম খণ্ড মাত্র। তৃতীয় গ্রন্থ রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র', আনুমানিক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে সংকলিত। রাধামোহন শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর। তখনকার কালে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের ইনি প্রধান ছিলেন। শুধু পদসংকলন করিয়াই রাধামোহন ক্ষান্ত হন নাই, সংকলিত পদগুলির টীকাও লিখিয়াছিলেন সংস্কৃতে। চতুর্থ গ্রন্থ বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' বৃহত্তম সংগ্রহ, পদাবলী-সংখ্যা চারি হাজারের উপর। 'বৈষ্ণবদাস' ছদ্মনাম, আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। পদকল্পতরুর সংকলনকাল আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ। অন্য পদসংগ্রহ ও বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থে বহু অতিরিক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। সবগুলি জড়ো করিলে সাত-আট হাজারের কম হইবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর কথা প্রথম তুলিয়াছিলেন মহাপণ্ডিত মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। জগবন্ধু মৈত্র বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়া বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বৈষ্ণব কবিতার প্রথম উপস্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার অনেক আগেই অল্পস্বল্প বৈষ্ণব পদাবলী বটতলার প্রকাশকেরা ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু সস্তা কাগজে অপরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত বই ইংরেজী শিক্ষিতেরা অবজ্ঞা করিতেন। জগবন্ধু মৈত্রের বইও ভাল প্রচারিত হয় নাই। তাহার পর যখন অক্ষয়চন্দ্র সরকার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়া বাহির করিলেন তখনই সাহিত্যপ্রিয় শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টি বৈষ্ণব পদাবলীর উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর অনেকেই পদাবলী-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চণ্ডীদাসের নীলরতন মুখোপাধ্যায়। রমণী মোহন মল্লিক কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তার পদাবলী স্বতন্ত্রভাবে ছাপাইয়াছিলেন। জগবন্ধু মৈত্র চৈতন্য-পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'গৌর-পদতরঙ্গিনী' সঙ্কলন করিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু সঙ্কীর্ণ, ভাব সুনির্দিষ্ট। সেই কারণে পুনরুক্তি অত্যন্ত প্রকট। পদকর্তারা সকলেই ভাল লিখিতেন এমন নয়। তবে কীর্তনগানের সুরতালের আবরণে পদের ভাষা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া পুনরুক্তি অরুচিকর হয় না। তবে আধুনিক পাঠক যখন পদাবলী পড়েন তখন সুরতালের অভাবে ভাষার দৌর্বল্য ও ভাবের কৃত্রিমতা রসগ্রহণে বাধা দেয়। সেইজন্য ভালো ভালো পদ নির্বাচন করিয়া একটি আধুনিক কালের উপযোগী ছোট পদাবলী-সংকলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় বাহির করিলেন। বইটির নাম 'পদরত্নাবলী'। ইহাতে বলরামদাসের কয়েকটি নূতন পদ আছে। শ্রীশচন্দ্র বলরামদাসের বংশধর ছিলেন।

পুরানো পদাবলী-সংকলনগুলি কীর্তন-পদাবলী-রচয়িতা ও গায়কদের ব্যবহারের জন্য গ্রথিত হইয়াছিল। সেইজন্য বিষয়, রস ও ভাব পর্যায় অনুসারে পদগুলি সাজানো।

বৈষ্ণব পদাবলীর রস পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন তাহা গানে শুনিতে হইবে তেমনি বৈষ্ণব-অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসারে ব্রজলীলার বিষয়, রস ও ভাবপর্যায়ও জানিতে হইবে।

প্রাচীন পদাবলী-সংগ্রহ মোটামুটি কৃষ্ণলীলা বিষয় ও ভাব অনুসারে দুইটি পর্যায়ে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমে মাতা-পিতা, সখা-সখীদের সঙ্গে বিবিধ লীলা। দ্বিতীয় রাধার সঙ্গে একান্তে প্রেমলীলা।

(১) কৃষ্ণের জন্মোৎসব (নন্দোৎসব), রাধার জন্মোৎসব, কৃষ্ণের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা, কৌমারলীলা, গোষ্ঠলীলা, গোবর্ধনধারণ, শারদরাস, বাসন্তরাস, হোরি, দানলীলা, নৌকাবিলাস, দোল, ঝুলন, কালিয়াদমন, অক্রূর-আগমন, মথুরা-গমন, ব্রজজনের বিরহ বিচেষ্টিত।

(২) রাধার পূর্বরাগ[১], কৃষ্ণের পূর্বরাগ, রাধার ও কৃষ্ণের রূপানুরাগ[২], রাধার অভিসার উদ্যোগ, মিলন বেশ ধারণ 'বাসকসজ্জা', বিভিন্ন ঋতুতে অভিসার, কৃষ্ণের অনাগমনে রাধার দুঃখ ('খণ্ডিতা'), মান, কৃষ্ণকে প্রত্যাখান ('কলহান্তরিতা'), দৌত্য, প্রেমবৈচিত্ত্য[৩], আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্গার[৪], নিত্যরাস, কৃষ্ণের বিরহ আশঙ্কা ('ভাবী বিরহ'), কৃষ্ণের মথুরাগমনকালে বিরহদুঃখ ('ভবন বিরহ'), বিরহসন্তাপ ও বৈক্লব্য, প্রলাপ, স্বপ্নরসোদ্গার, ভাবোল্লাস।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দুইটি ভাষারীতি দেখা যায়। একটি সাধাসিধা বাঙ্গালা, আর একটি সোজাসুজি বাঙ্গালা নয়—ব্রজবুলি। ব্রজবুলি নামটি আধুনিক কালে দেওয়া। অনাধুনিক কালে পদকর্তারা ও কীর্তনীয়ারা দুইটি ভাষারীতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিতেন এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগ, যখন হইতে রূপ গোস্বামীর নির্দিষ্ট সূত্র অ-সারে পদাবলী রচিত হইতে শুরু হইল, তখন হইতে অধিকাংশ পদকর্তার ঝোঁক পড়িয়াছিল ব্রজবুলির উপর। ব্রজবুলির শব্দ, পদ, অন্বয়, বাগ বিধি ও ছন্দে অবহট্‌ঠ হইতে মৈথিলী ভাষায় পরিগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা দেশে চলিত হইয়াছিল। সেইজন্য ব্রজবুলি ভাষায় ঠাট বাঙ্গালী পদকর্তাদের কাছে ব্রজভাষার (মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের হিন্দীর) মত লাগিত। রাধাকৃষ্ণ ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব এই ভাষা তাঁহাদের কথিত ভাষার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বলিয়া হয়ত তাঁহাদের অস্ফুট ধারণা ছিল। তাই কেহ কেহ ইহাকে 'ব্রজভাষা' বলিয়া ছিলেন। পদাবলীতে ব্রজবুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবার আসল কারণ ছন্দসুভগতা। ব্রজবুলির পদ বাঙ্গালা পদের মত স্বরান্ত নয়, এবং ছন্দে মাত্রাগত বলিয়া শব্দের অক্ষরের মাত্রা-নিয়মনে স্বাধীনতা আছে। মাত্রাছন্দে ধ্বনিঝঙ্কার তোলা অনেক

১। পূর্বরাগ=প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ, প্রেমে পড়া। নানা রকমে হইতে পারে—চোখে দেখিয়া, গুণ শুনিয়া, ছবি দেখিয়া অথবা স্বপ্নে দেখিয়া।

২। অনুরাগ=প্রেমের দ্বিতীয় অর্থাৎ গাঢ় অবস্থা। রূপানুরাগ=রূপ দেখিয়া প্রেমের গাঢ়তা-প্রাপ্তি। আক্ষেপানুরাগ=অনুরাগের আধিক্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনুপস্থিত প্রিয়কে, নিজেকে ও স্বজনকে ভর্ৎসনা।

৩। প্রেমবৈচিত্ত্য=গাঢ় অনুরাগ।

৪। রসোদ্গার=গাঢ় প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বিগত দিনের সুখস্মৃতির রোমন্থন।

সহজসাধ্য ছিল। এমন কি ব্রজবুলির ছন্দঃস্পন্দ বাঙ্গালায় সৃষ্টি করা প্রায়ই অসম্ভব ছিল। অথচ ব্রজবুলির ব্যাকরণ বাঙ্গালার মত দৃঢ় নিয়মবদ্ধ ছিল না, শব্দের বহর ইচ্ছামত ছোট বড় করিবার স্বাধীনতা ছিল। তা ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনিবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ছিল নির্বাধ। বাঙ্গালা পদের প্রয়োগও নিষিদ্ধ ছিল না। সুতরাং যেমন তেমন পদ ব্রজবুলিতে খাড়া করা মোটেই শক্ত কাজ ছিল না। তা ছাড়া খোলের বোলের সঙ্গে ব্রজবুলির কাটা কাটা ছন্দ তাল খুব মিল খাইত। কল্পিত উদাহরণ দিয়া বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি। জ্ঞানদাসের একটি বাঙ্গালা পদের প্রথম দুই ছত্র নেওয়া যাক।

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া॥

এখানে আমরা শুধু 'গোরা' পদের স্থানে 'গৌর', 'নিমাই', 'প্রভু' ইত্যাদি দুই অক্ষরের প্রতিশব্দ বসাইতে পারি। কিন্তু ব্রজবুলিতে নানাভাবে বলা যায়। যেমন,

(১) সহচর-অঙ্গহি হেলন অঙ্গ।
চলইতে মুহু করু ধরণী-সঙ্গ॥

এখানে 'করু' স্থানে 'কর' অথবা 'করে' বসানো যায়। দ্বিতীয় ছত্র এমনও লেখা যায়

(২) ক্ষণহি করল পহু ধরণী-সঙ্গ॥
করু অবলম্বন সহচর-অঙ্গ।
মুরছি পড়ত ক্ষণ পহু গতিভঙ্গ॥
সহচর-অঙ্গ পর হেলন পহু।
চলই ন পারই মুরছি পহু॥

বাঙ্গালায় একমাত্র 'করিল' পদের স্থানে ব্রজবুলিতে পাই অন্তত তিনটি অতিরিক্ত পদ 'করল', 'করু', 'কর'। বাঙ্গালায় সপ্তমীতে শুধু একটি পদ 'অঙ্গে', কিন্তু ব্রজবুলিতে অতিরিক্ত পাই 'অঙ্গ', 'অঙ্গহি', 'অঙ্গপর' ইত্যাদি। অর্থাৎ দুই অক্ষরের পদের স্থানে ইচ্ছামত তিন অথবা চারি অক্ষরের পদও ব্যবহার করা যায়।

ব্রজবুলির ছন্দে মাত্রাবৃত্ত জয়দেবের থেকে নেওয়া। তবে গীতগোবিন্দে যে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে তা বৈষ্ণব পদাবলীতে নাই, যদিও গীতগোবিন্দে নাই এমন দুই একটি ছন্দোরূপান্তরও বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা দিয়াছে। জয়দেবের গানের ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃত শব্দে স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘত্ব অপরিবর্তনীয় এবং পদের বানানে নির্দিষ্ট। ব্রজবুলিতে তেমন নয়। এখানে স্বরধ্বনির মাত্রা বানান অনুযায়ী নয়, উচ্চারণ অনুযায়ী। সুতরাং কান দুরস্ত না হইলে ব্রজবুলির কবিতার ছন্দঃস্পন্দ ঠিকমত ধরা যায় না।

ব্রজবুলি-পদাবলীতে যে কয়টি প্রধান ছন্দঃ মিলে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া এবং জয়দেবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখাইতেছি।

১ দুই সমান অর্ধে বিভক্ত ষোল মাত্রার ছন্দ

জয়দেব

মুহু রব লোকিত | মণ্ডন লীলা।
মধুরিপুরহমিতি | ভাবনশীলা॥

পদাবলী

হাথক দরপন | মাথক ফুল[১]।
নয়নক অঞ্জন | মুখক তাম্বূল[২]॥

২. তিন যতিতে (৮, ৮, ১২) বিভক্ত আটাশ মাত্রার ছন্দ

জয়দেব

রজনি জনিত গুরু- | জাগর রাগ-ক-[৩] |
ষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনু- | রাগমিব স্ফুট- |
মুদিত রসাভিনিবেশম্॥

পদাবলী

নীরজ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

এখানে "নীরজ" এর "নী" দীর্ঘ কিন্তু "নীর" এর "নী" হ্রস্ব। "বিন্দু বিন্দু" পড়িতে হইবে "বি দু বি দু", "চুয়ত" পড়িতে হইবে "চুয়ত"।

এই ছন্দে ব্রজবুলিতে অতিরিক্ত মাত্রা সংযোগে কিছু নূতন রূপ পাইয়াছে। যেমন,

(ক) গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।

১ দুইটি স্বরই দীর্ঘ পড়িতে হইবে। শেষ স্বর বলিয়া হ্রস্ব পড়িলেও চলে।

২ "উবুলা" (অথবা "উবল") পড়িতে হইবে।

৩ "কষায়িত" শব্দের "ক"-এর পর দ্বিতীয় যতি পড়িয়াছে।

(খ) চম্পক-শোন-কুসুম কনকাচল

জিতল গৌরতনু-লাবণিরে।

৩ তিন যতিতে বিভক্ত (১০, ১০, ১৪) চৌত্রিশ মাত্রার ছন্দ

জয়দেব

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনানলো

হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥

পদাবলী

কাহে তুহু কলহ করি | কান্ত-সুখ তেজলি |

অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে।

মেরুসম মান করি | উলটি ফিরি বৈঠলি |

নাহ ঘর চরণ ধরি সাধে॥

এ ছন্দ পদাবলীতে অষ্টাদশ শতাব্দের আগে পাই নাই।

৪. চারি যতিতে বিভক্ত (১২, ১২, ১২, ১০) ছেচল্লিশ মাত্রার ছন্দ (জয়দেবে নাই)

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ | মধুপ-শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ |

কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন | মঞ্জুল কুলনারী।

ঘন-গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ | মালতি ফুল মালে রঞ্জ |

অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী | খঞ্জনগতি-হারী॥

৫ তিন যতিতে বিভক্ত (৬, ৬, ১০) বাইশ মাত্রার ছন্দ (জয়দেবে নাই, রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলী'তে আছে)।

রূপ গোস্বামী

কুর্বতি কিল | কোকিল কুল |

উজ্জ্বল-কল-নাদম।

জৈমিনিরিতি | জৈমিনিরিতি |
জল্পতি সবিষাদম্‌ ॥

পদাবলী

দৈর্ঘ্যং ব্রজ | দৈর্ঘ্যং ব্রজ |
গচ্ছং মথুরায়ে।
টুভব পুরি | পতি প্রতক্ষে |
যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥

(ক) প্রথম দুই যতিতে একমাত্রা করিয়া বেশি দিয়া (৭, ৭, ১০)

রূপান্তর

জিতি কুঞ্জর- | গতি মন্থর |
চলত সো বরনারী।
বংশীবট | যাবট তট |
বনহি বন হেরি ॥

এই দুই ছন্দ অষ্টাদশ শতাব্দের আগে চলিত হয় নাই।

৬. ষোল মাত্রার ছন্দ, প্রথম দুই মাত্রা হ্রস্ব, অতিরিক্তবং। দীর্ঘস্বরে ঝোঁক আছে। ছক এই রকম

শুক-	গঞ্জন	চন্দন	অঙ্গভূ-	ষা।
রাধা-	কাঞ্চনি-	ভাস্বত-	বভর-	সা ॥

প্রাকৃত হইতে গৃহীত সংস্কৃতে তোটক ও পজ্‌ঝটিকা ছন্দের ইহা সগোত্র।

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে তিনটি প্রধান স্তর। এক চৈতন্য-পূর্ববর্তী, দুই চৈতন্য সমকালীন, তিন চৈতন্য-পরবর্তী। চৈতন্য-পূর্ববর্তী স্তরে আমরা জয়দেব ছাড়া দুইজন প্রধান কবিকে পাই—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি মিথিলার লোক, পঞ্চদশ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার পদাবলী চৈতন্যের সমকালেই খুব সমাদৃত ছিল। বিদ্যাপতির গানে চৈতন্যের আগ্রহ মৈথিল কবির রচনাকে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের কাছে প্রিয়তর করিয়াছিল। পরবর্তী শতাব্দে বৈষ্ণব সাধক-কবিরা জয়দেব ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে

বিদ্যাপতিকেও "রসিক" অর্থাৎ সিদ্ধহস্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি নামে বাঙ্গালী কবিও পদ রচনা করিয়াছিলেন। সে পদাবলী বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি—দুই ভাষা ছাঁদেই পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা পদগুলি বাঙ্গালী কবির রচনা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে। কিন্তু ব্রজবুলি পদগুলির সম্বন্ধে সংশয় রহিয়া যায়।

বিদ্যাপতির জীবিতকাল সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি নিসংশয় যে, তিনি অন্তত ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া উপায় নাই। চৈতন্য চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গান শুনিতেন। সুতরাং তিনি চৈতন্যের পূর্ববর্তী। কিন্তু কতদিন আগেকার লোক ছিলেন তিনি, তাহা বলিবার উপায় নাই। চণ্ডীদাসের সমস্যা এখানেই শেষ নয়। চণ্ডীদাসের নামে অজস্র পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির অধিকাংশ যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের নয় সে বিষয়ে মতান্তর নাই। যেগুলি বাকি থাকে তাহা লইয়া পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ আছে। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে, চৈতন্য-সমকালীন ও চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তাদের অনেক ভালো পদ পরে চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত হইয়াছে।

প্রস্তুত সংকলনে যে সব পদকর্তার রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে এই কয়জন সুনিশ্চিতভাবে চৈতন্য-সমকালীন—

গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, বংশীবদন, নরহরিদাস (পদটি যদি নরহরি চক্রবর্তীর না হয়), শ্রীরঘুনন্দন (পদটি যদি তাঁহার নিজের লেখা হয়), মাধব (পদগুলি যদি মাধব আচার্যের অথবা মাধব ঘোষের হয়), জ্ঞানদাস, বলরামদাস (প্রাচীনতর কবি), অনন্তদাস (যদি ইনি অনন্ত আচার্য হন)।

চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলী তিন উপস্তরে ভাগ করিতে হয়। প্রথম, ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগ ; দ্বিতীয়, সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ ; তৃতীয়, অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ।

প্রথম উপস্তরের মুখ্য পদকর্তারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্য ও অনুশিষ্য। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীর অথবা নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের শিষ্য ও প্রশিষ্য। কেহ কেহ ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরিদাসের অথবা রঘুনন্দনের শিষ্য ও প্রশিষ্য। অনেকেই ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের অথবা নরোত্তমের শিষ্য ও প্রশিষ্য। প্রস্তুত সংকলনে এই পদকর্তারা প্রথম উপস্তরের মধ্যে পড়েন—

নরোত্তম, "দুখিনী" (অর্থাৎ শ্যামানন্দ), দুইজন গোবিন্দদাস (কবিরাজ এবং চক্রবর্তী), যদুনাথ, যদুনন্দন, বল্লভ (বল্লভদাস এবং কবি বল্লভ), কানাই, শেখর (রায়শেখর এবং কবি-শেখর ; দ্বিতীয় স্তরেও এক কবি-শেখর ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়), ভূপতি, শ্যামদাস, ঘনশ্যাম।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরেও গুরুপরম্পরাক্রমে পদাবলী-রচনা চলিয়াছে। দ্বিতীয় উপস্তরের মধ্যে পড়েন—

বিপ্রদাস ঘোষ, নাসির মামুদ, ঘনরাম দাস, জগদানন্দ, যাদবেন্দ্র, বৃন্দাবন, প্রেমদাস, রাধামোহন।

তৃতীয় উপস্তরের অন্তর্গত হইতেছেন—
চন্দ্রশেখর ও শশী (শশিশেখর)।
এই দুই নাম ভিন্ন ব্যক্তির না হওয়া অসম্ভব নয়।

বৈষ্ণব-কর্তাদের সময় বিচারে একটা বড় অসুবিধা এই যে, এক নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। যেমন বলরাম দাস নামে তিন চারি জন, বল্লভ নামে চারি পাঁচজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ইঁহাদের অধিকাংশের ভণিতাটুকু ছাড়া কোন পরিচয় নাই। এইজন্য অধিকাংশ পদকর্তার কালবিচার নিতান্তই আনুমানিক।

যে কীর্তনগান এখন প্রধানতঃ শ্রাদ্ধবাসরে আমাদের পরিচিত সেই পদ্ধতি তৃতীয় উপস্তরে উদ্ভূত। এ পদ্ধতিতে পদকে দীর্ঘায়িত করিয়া গাওয়া হয়। দুই উপায়ে তাহা সাধিত হয়। ছত্রের সঙ্গে অথবা ছত্রকে ভাঙ্গিয়া তাহার সঙ্গে ব্যাখ্যাত্মক অথবা অন্যরকম ভাবপরিবর্ধক ছোট বাক্য অথবা বাক্যাংশ যোগ করা হয়। ইহাকে বলে "আখর", "আখর দেওয়া"। অথবা পদের মধ্যে কিছু ব্যাখ্যামূলক অথবা ভাববিস্তারক একাধিক ছত্র যোগ করা হয়। এ ছত্রগুলি অল্পবিস্তর গদ্যধর্মী বা পদ্যছত্র এবং এগুলিকে পদের বাহিরে আনিয়া দেখিলে স্বতন্ত্র রচনা হিসাবে মূল্য দেওয়া যায়। ইহার নাম "তুক"। আখর ও তুকের উদাহরণ দিতেছি।

বৈষ্ণব পদাবলী গেয় কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ণ মূল্য গানে না শুনিলে উপলব্ধ হয় না। তবে ইহার সাধারণ গানের মত সুরের বাহক, ছন্দোবদ্ধ বাক্যজালময় নয়। পাঠ্য গীতিকবিতায় অপেক্ষিত কাব্যরস ইহাতে আছে। তবুও সাধারণ গীতিকবিতা হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর স্বাতন্ত্র্য মানিতে হইবে। প্রেম অথবা বাৎসল্য যে রসই থাকুক না কেন, বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তিরসেরই পরিক্রমা। বৈষ্ণব-সাধনার অঙ্গ বলিয়াই যে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুশীলন হইয়াছিল সে কথা মানি, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে সাধনার ইঙ্গিত আছে, তাহা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সহিত বিচ্ছিন্ন, কোন শুষ্ক বৈরাগ্যচর্চা নয়। যে স্নেহ-প্রেম সম্পর্ক মানুষকে তাহার জীবনের মধ্য দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, তাহাই কৃষ্ণলীলা। রূপকের মধ্য দিয়া জীবনমরণাতীত নিত্য সম্পর্করূপে বৈষ্ণব পদাবলীতে উপস্থাপিত। বৈষ্ণব পদাবলীর রস গ্রহণ করিতে গেলে আমাদের বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই, কৃষ্ণকে অবতার অথবা অবতারী মানিবার প্রয়োজন নাই, এমন কি নাস্তিক হইলেও দোষ নাই। মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক সেই ভালো-লাগাকে চিরন্তন করিয়া ভালোবাসিবার ঈপ্সা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণার উৎস। বৈষ্ণব কবিতার এই ধর্মাতিশায়ী উৎকর্ষের দিকে রবীন্দ্রনাথই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতা বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যে বৈষ্ণব পদাবলী তাহাও তিনিই নির্দেশ করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।

এ ভরা-বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬০

শ্রীসুকুমার সেন

সূচী

(অকারাদিক্রমে)

বৈষ্ণব পদাবলী

(চয়ন)

প্রথম স্তবক

মাঙ্গলিকী

শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল, ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল
জয় জয় দেব হরে ॥ ১ ॥

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন, ভব-খণ্ডন,
মুনিজন-মানস-হংস
জয় জয় দেব হরে ॥ ২ ॥

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন, জন-রঞ্জন,
যদুকুল-নলিন-দিনেশ
জয় জয় দেব হরে ॥ ৩ ॥

মধু-মুর-নরক-বিনাশন, গরুড়াসন,
সুরকুল-কেলি-নিদান
জয় জয় দেব হরে ॥ ৪ ॥

অমল-কমল-দললোচন, ভবমোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান
জয় জয় দেব হরে ॥ ৫ ॥

হে কমলা-হৃদয়-বিহারী, কুণ্ডলধারী, ললিত-বনমালাবিভূষণ দেব হরি, তোমার জয় হউক ॥১॥
হে সূর্য্যমণ্ডল-ভূষণ, ভববন্ধন-ছেদনকারী, মুনিগণের মানস-সরোবরের হংস দেব হরি, তোমার জয় হউক ॥২॥
হে কালিয়-ভুজঙ্গ-দমন, জনগণরঞ্জন, যদুকুল-পঙ্কজ-রবি দেব হরি, তোমার জয় হউক ॥৩॥
হে মুরারি, হে মধুসূদন, হে নরকাসুর-বিনাশন, গরুড়-বাহন, দেবগণের আনন্দলীলার আদি কারণ দেব হরি, তোমার জয় হউক ॥৪॥
হে পদ্মপলাশলোচন, সংসার-দুঃখ-হরণ, ত্রিভুবনাধার দেব হরি, তোমার জয় হউক ॥৫॥

জনক-সুতা-কৃতভূষণ, জিত-দূষণ,
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ
জয় জয় দেব হরে ॥ ৬ ॥
অভিনব-জলধর-সুন্দর, ধৃতমন্দর,
শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর
জয় জয় দেব হরে ॥ ৭ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয় দেব হরে ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতি,
জয় জয় দেব হরে ॥ ৯ ॥

হে জানকীভূষণ, হে দূষণ-রাক্ষস-নাশন, হে দশানন-দমন দেব হরি, তোমার জয় হউক ।৬।
হে নবজলধর-সুন্দর, হে মন্দর-ধারী, হে কমলা-মুখচন্দ্রের সুধাপায়ী চকোর দেব হরি, তোমার জয় হউক ।৭।
তোমার চরণে আমরা প্রণত ইহা ভাবিয়া আমাদের কুশল কর ; হে দেব হরি, তোমার জয় হউক ।৮।
শ্রীজয়দেব কবির উজ্জ্বলরসাশ্রিত গীতময় এই মাঙ্গলিক বচন আমাদের আনন্দ বিধান করে। হে দেব হরি, তোমার জয় হউক ।৯।

দ্বিতীয় স্তবক

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

১

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর॥

১। নীরদ……অবলম্ব—চক্ষুদুটি মেঘের ন্যায়, কেন না, উহা অবিরত জলধারা বর্ষণ করিতেছে। অবিরল বারিপাত হইলে যেমন বৃক্ষে বৃক্ষে মুকুল হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদগম হইতেছে। জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ চৈতন্যপ্রভুকে পুষ্পতরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নিরবধি চোখের জলে এই তরু বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গের স্বেদজল মকরন্দের মত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে।

মুকুল-অবলম্ব—মুকুলের অবলম্বন-তরু। কদম্ব—সমূহ।

বিকশিত ভাব-কদম্ব—অশ্রু, পুলক, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের সহিত অন্যান্য নানাপ্রকার ভাব প্রকাশিত হইতেছে। পেখলুঁ—দেখিলাম। গৌর কিশোর—কিশোর-বয়স্ক গৌরাঙ্গ

অভিনব…সঞ্চরু—ভাগীরথীর তীর উজ্জ্বল করিয়া যেন একটি সোনার গাছ চলিয়া বেড়াইতেছে (সঞ্চরু)।

অভিনব—আর কখনও যাহা দেখা যায় নাই।

কল্পতরু—শ্রীচৈতন্য গৌরবর্ণ বলিয়া, তাঁহাকে সোনার গাছ বলা হইয়াছে; কিন্তু তিনি সামান্য তরু নহেন, তিনি পরম বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন, প্রেমস্বরূপ অপার্থিব ফল বিতরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে কল্পবৃক্ষ বলা হইয়াছে। উজোর—উজ্জ্বল। চঞ্চল—নৃত্যপরায়ণ।

চরণ-কমল-তলে ঝঙ্করু—চরণতলে ঝঙ্কার করিতেছে; অর্থাৎ ভক্তগণ (বিভোর হইয়া) পদতলে নানা গুণগান করিতেছেন। পরিমলে লুবধ—সুগন্ধে লুব্ধ হইয়া। ধাবই—ধাবিত হইতেছে।

অগোর—অজ্ঞান। তাঁহার পদতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অচৈতন্য অর্থে গ্রাম্যভাষায় অঘোর শব্দের ব্যবহার আছে।

অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

২

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনি রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে॥
বিপুল পুলককুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
সো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

অখিল…পূর—সমস্ত বিশ্বের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে।
তাকর…দূর—শুধু দীনহীন গোবিন্দদাস তাঁহার (তাকর) সেই চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া আছে।
২। চম্পক…লাবণি রে—গৌরদেহের লাবণ্য চাঁপা, শোনফুল ও সুবর্ণ-গিরিকে পরাজিত করিয়াছে।
উন্নত গীম—গ্রীবাদেশ সমুন্নত।
সীম নাহি অনুভব—গৌরদেহের লাবণ্য চম্পক, শোনপুষ্প এবং সুবর্ণ-গিরিকে পরাজিত করিয়াছে, একথা বলিয়াও পদকর্ত্তার মন তৃপ্ত হইল না,—মনে হইল এত বলিয়াও কিছুই বলা হইল না। তাই এখন বলিতেছেন, সে সৌন্দর্য্যের সীমা অনুভব করা যায় না অর্থাৎ সে সৌন্দর্য্য ধারণাতীত।
জগ-মনোমোহন—জগতের মনোমোহকর। ভাঙনি—ভঙ্গি। মণ্ডন—অলঙ্কার, শোভা।
কলিযুগ…খণ্ডন—কলিযুগরূপ কালসর্পের ভয় যিনি খণ্ডন করেন।
বিপুল…কলেবর—সকল শরীরে রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত হইয়াছে। লহু—লঘু, মৃদু।
কত মন্দাকিনী…ঝরে—কত স্বর্গঙ্গা নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।
নিজ-রসে—নিজের প্রেম-রসে। তিনি আপনার প্রেমে আপনি নাচিতেছেন।
গাওত…মেলি—কত ভক্ত মিলিয়া গান করিতেছে।
সো রসে…ভেলি—যে রসে, যে প্রেমবন্যায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, গোবিন্দদাস (পদকর্ত্তা) সেই প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক, তাহার স্পর্শ হইতেও বঞ্চিত রহিল।

৬

পরশ-মণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরাণ-পুতুলি॥
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কী রে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদিয়া-পুরে
মনের আন্ধার দূরে গেলো॥
এ গুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেমধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোসাঁই রে
বিচার করিয়া দেখ সভে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে

৭

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।

৬। পরশ-মণির···জনা—স্পর্শমণির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কি তুলনা দিব? স্পর্শমণি যাহা স্পর্শ করে তাহাই কেবল সোনা হইয়া যায়। গৌরাঙ্গদেবের কিন্ত এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, সে শক্তির প্রভাবে যে কোন ব্যক্তি নাচিয়া গাহিয়া অনায়াসে রত্ন হইয়া যায়।

এ গুণে···প্রেমধন—গুণের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কামধেনু বা সুরতরুর (কল্পতরুর) তুলনা হয় না। কারণ, পুণ্যাত্মা ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে কামধেনু বা সুরতরুর সান্নিধ্য-লাভ ঘটে না; তাহা ছাড়া কামধেনু বা সুরতরুর নিকট প্রার্থনা না করিলে কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু গৌরাঙ্গদেব এমনই করুণাময় যে, আপামর সকলকেই তিনি (না চাহিতেই) নিজে যাচিয়া প্রেমধন বিলাইয়া দেন। সুরভি—কামধেনু।

৭। করতলে···অবলম্ব—হস্তের উপর মুখ ন্যস্ত করিয়া আছেন।

পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন-কমল—সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

৫

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর-মুখ চায়॥
কোথায় পরাণনাথ বলি খেণে কান্দে।
পুরব বিরহ-জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেন হেন হৈল-গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

পুন পুন…পন্থ…তুলনীয়: "ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।"—চণ্ডীদাস॥—৬১ পৃষ্ঠা।

ঘর পন্থ—ঘর ও বাহির (পথ)।

খেনে…একান্ত—তুলনীয়: "মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়।" —চণ্ডীদাস।—৬১ পৃষ্ঠা।

পুলক…থেহ—পুলকে সমস্ত দেহ শিহরিত। পুলক-মুকুলবর—পুলকজাত রোমাঞ্চ; ভরু—ভরিল। রাধা-মোহন (পদকর্তা) সে অতলস্পর্শ প্রেমসাগরের কোন থৈ (থেহ) অর্থাৎ তল খুঁজিয়া পাইল না। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগোক্ত রাধা-ভাবের সঙ্গে এই পদের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে বর্ণিত চৈতন্যদেবের প্রথম ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন।

৫। খেণে—ক্ষণে, ক্ষণেক্ষণে।   মুরছিয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া।

অতি দুরবল…যায়—দেহ এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে ধরিয়া রাখা যায় না, অর্থাৎ খাড়া করিয়া রাখা দুষ্কর,—ক্ষণে ক্ষণে টলিয়া পড়ে।

পুরব—পূর্ব।

থির নাহি বান্ধে—স্থৈর্য্যের বন্ধন থাকে না, অর্থাৎ স্থৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।

পুরব…বান্ধে—রাধাভাবে ভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গদেব নিজের সহিত শ্রীরাধার একাত্মতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, এবং তাহার ফলে অতীতের কৃষ্ণবিরহ-জ্বালায় জর্জরিত হইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেছেন।

নিছনি—বালাই।

৬

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি॥
বরন-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি- দুলহ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাস

৭

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র-চুলে।
ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥

৬। পতিত হেরিয়া কাঁদে—পতিত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া করুণায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।
স্থির নাহি বাঁধে—তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মন অস্থির হইয়া যায়।
করুণ নয়নে চায়—করুণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন।
নিরুপম হেম...যায়—অতুলনীয় স্বর্ণ-নিন্দিত উজ্জ্বল (উজোর) গোরার দেহ ঘন ঘন ভূমিতে পড়িয়া যায়।
নিছনি—বালাই। পিরীতি-চাতুরী—তাঁহার প্রেমের বিচিত্র ভাবে।
বরন-আশ্রম—বর্ণাশ্রম; বর্ণাশ্রমের বিভিন্নতা, এবং ধনী বা দীন-দরিদ্র কাহারও প্রভেদ বা দোষ গণ্য করে না। বিহি—বিধাতা। দুলহ—দুর্লভ।
কমলা...জগজনে—লক্ষ্মী, শিব ও বিধাতার পক্ষেও যে প্রেম দুর্লভ, তাহা জগজ্জনকে বিতরণ করে।
প্রেমধনের...গোবিন্দদাস—সমস্ত পৃথিবীবাসীকে প্রেমধনের ধনী করিলেন—কেবল গোবিন্দদাস বঞ্চিত রহিল। কয়ল—করিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী।
চারি দিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণী ॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর ॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ॥
কাঁদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥

৮

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥

৯

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ ॥

৭। এই পদে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বাভাস পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন।
বেশর—নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ। বজর—বজ্র।
৮। পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া। তো সবারে—তোমাদিগের সকলকে।
কোরে—কোলে। কাতরে—কাতর ব্যক্তিকে। বিলাস—আনন্দ;
মিলিয়া—মিলাইয়া, তুলনীয়: 'পাষাণ মিলঞা যায়।'
৯। অরুণ-বসন—গেরুয়া বস্ত্র।

শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে ॥
সকল মোহান্ত-ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ ॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরম-ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥

১০

হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈত-মন্দিরে চল যাই।
নিমাঞি আইল তাহা কহিল নিতাই ॥
সে চাঁচর-কেশ-হীন কেমনে দেখিব।
দণ্ড-কমণ্ডলু দেখি পরাণ ত্যজিব ॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া ॥
ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
দুঃখিত বলভ যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥

উচ্চ রায়—উচ্চ রবে, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনের রোলে।
জিয়ে—বাঁচে। বিধাতা—হরিদাস, ব্রহ্মার অবতার বলিয়া গৃহীত।
জলন্ত অনল—রূপ-যৌবন-সম্পন্না রমণীতে মানুষের মন স্বভাবতঃ অনলে পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইলেন না কেন?
লেহ, নেহ—স্নেহ, প্রেম। শুধু অতুলনীয় রূপ-যৌবন-সম্পন্না স্ত্রী নহে, তাহার প্রগাঢ় প্রেম উপেক্ষা করিলেন কেন?
১০। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে আসিয়াছেন, নিতাই সেই সংবাদ লইয়া নবদ্বীপে আসিলে শচীমাতা বলিতেছেন।
চাঁচর—কুঞ্চিত। বলভ—কবির নাম

১১

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়াইছে মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করযোড় করি আগে দাঁড়াইলা মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চাঁদ-মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভদাস গোরাচাঁদের বৈরাগ
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

১২

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ॥

১১। ঝুরে—কান্দে। পড়াইল—পড়াইলাম।
ইহার লাগিয়া—ইহারই জন্য, তুমি অবশেষে সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ত্যাগ করিবে এই জন্য।
বিদার মাগে—বিদারিত হইতে চায়, ফাটিয়া যাইতে চায়।

১২। জগদানন্দ—মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্ত, ইনি পুরীতে তাঁহার নিত্যসহচর ছিলেন। মহাপ্রভু খাওয়া-দাওয়াতে কঠোর ভাব অবলম্বন করিলে ইনি অভিমান করিয়া নিজে না খাইয়া থাকিতেন। এই অভিমান-পরায়ণতার জন্য ভক্তমণ্ডলী ইঁহাকে সত্যভামার অবতার মনে করিয়াছেন। একদা মহাপ্রভু ভক্ত-দত্ত সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই তৈলদ্বারা পুরীর মন্দিরে আলো জ্বালিবার আদেশ প্রদান করিলে জগদানন্দ এতটা চটিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি

ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এহি অনুমানে যায়॥
লতা-তরু যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা॥
শাখে বসি পাখি মুদি দুটি আঁখি
ফল-জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কারও মুখে নাহি রা।
মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ে গা॥

১৩

আজিকার স্বপনের কথা শুন লো মালিনী সই
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥

আঙিনায় সেই তেলের হাঁড়িটি আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু জগদানন্দকে এই জন্য ভয় করিতেন ('জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।' —চৈ, চ,)। পুরীগমনের পরে শচীদেবীকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। এখানে সেই ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

গোকুলপুরের ছন্দ—কৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিলে তথাকার যে ভাব হইয়াছিল সেইরূপ। ছন্দ—ছাঁদ, ধারা, প্রায়।

পাই…যায়—শচী হয়ত চৈতন্যের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন কি না এই আশঙ্কা করিয়া যাইতেছেন।

রাতা—রক্তবর্ণ; মেঘগুলি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়াছে।

মাধবীদাস—পদকর্তা; তাঁহার ঠাকুর যে জগদানন্দ, তিনি নবদ্বীপের এই অবস্থা দেখিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়া পুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহ না উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি সদা দেখ তায়॥

১৩। যে শ্রীবাস মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন, এবং যাঁহার আঙিনায় মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিতে নৃত্য ও কীর্তন করিতেন, মালিনী সেই শ্রীবাসের স্ত্রী ও শচীদেবীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, শ্রীবাস চৈতন্যদেব হইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

তৃতীয় স্তবক

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও কালিয়দমন

১

দেখ মাঝি নাচত নন্দ-দুলাল।
মণিময় নূপুর কটিপর ঘাঘর
মোহন উরে বনমাল॥
গোপিনী কত শত বালক যুথ যুথ
গাওত বোলত ভাল।
তীব্র ঝিমিকি ধ্বনি তাথৈ তাথৈ শুনি
দুগধি দৃগধি বাজে তাল॥
লহু লহু হাসত ভাষ মৃদু বোলত
নিকসত মোতিম দন্ত রসাল।
শ্যামচাঁদ দাস ভণ জগজন-জীবন
পহু মোর পরম দয়াল॥

২

দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যায়
নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া॥
চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দেছে রাঙ্গা পায়
নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি॥

১। ঘাঘর—অলঙ্কার বিশেষ উরে—বক্ষে। যুথ যুথ—দলে দলে।
নিকসত—বাহির হয়, প্রকাশিত হয়। মোতিম—মুক্তা।
২। রামের মা—রোহিণী। নাট—নৃত্য।
চরণে চাঁদের হাট—পদকর্ত্তা এখানে শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণের দশটি নখকে চাঁদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। দশ-দশটি চাঁদ চরণে শোভা পাইতেছে। কবি তাই বলিতেছেন—দুই চরণে যেন চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে।

প্রতি পদচিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া যায়
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে।
যাদবেন্দ্র দাসে কয় নাটুয়া গোবিন্দ রায়
প্রেমভরে অধিক বিরাজে ॥

৩

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম ॥
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধব
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি ।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজাকার, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার চিহ্ন। এই ত্রিবিধ চিহ্ন ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিদ্যমান।
নাটুয়া—নৃত্যকারী। অধিক বিরাজে—অধিক শোভা পাইতেছেন।
যাদবেন্দ্র···বিরাজে—পূর্ব্বের পঙ্‌ক্তিতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান পদকর্ত্তা তাহা আমাদের স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন। এখন তিনি বলিতেছেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান্ আজ বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া যেন আরও অধিক শোভা পাইতেছেন, অর্থাৎ আরও অধিক মনোরম হইয়া উঠিতেছেন।
৩ আগে—সম্মুখে। নবনী-লোভিত—নবনী লুব্ধ।
পূরি—পূর্ণ করিয়া। ভালি—ভাল, উত্তম, সুন্দর।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড—গোপালের নৃত্য-রসে মজিয়া গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইল।

৪

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে   গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে   অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননি চোরা ॥
ধরিয়া যুগল করে   বাঁধিয়া ছান্দন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীরী রমণী হাসে   দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ শুধাইয়া ॥
অন্যের ছাওয়াল যত   তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে   না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে না পারে ॥
বলাই খায়াছে ননি   মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
পরের ছাওয়াল পাইয়া   মারেন আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥
অঙ্গদ-বলয়-তাড়   আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ   আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার ॥
বলরাম দাসে কয়   এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।
যশোদা আসিয়া কাছে   গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥

৪। গোপাল কান্দে অনুরাগে—এ কান্না দুঃখের কান্না নয়, ইহা অনুরাগের কান্না, সোহাগের কান্না, অভিমানের কান্না।

ছান্দন-ডোর—ছাঁদন-দড়ি। দোহন-কালে গাভীর পদবন্ধন রজ্জু।

আহীরী—গোয়ালিনী, গোপী।   ছাওয়াল—ছেলে, পুত্র।

পরের ছাওয়াল—শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত সন্তান নন। বসুদেবের ঔরসে, দেবকীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। কংসের ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা তাঁহাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন।

অঙ্গদ—একপ্রকার বাহুভূষণ।   বলয়—বালা।   তাড়—তাগা।

৫

আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
তোক-কৃষ্ণ অংশুমান্ দাম বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি বঙ্কিম ধটি বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে॥
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কানে কুণ্ডল-খেলা।
গলে লম্বিত গুঞ্জাহার ভুজে অঙ্গদ-বালা॥
স্ফুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা॥

৬

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর।
অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা-বেত্র-বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাড়াঞা রাজপথে॥
বিশাল অর্জুন অংশুমান্ কিঙ্কিণী অংশুমান্
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়॥
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥

৫। রঙ্গিয়া—রঞ্জিন। কটি কাছনি…ধটি—কটি বেড়িয়া মালকোঁচা বঙ্কিমভাবে পরা। কাঁখে—কক্ষে জিতি—জয় করিয়া। গো-ছান্দন কান্ধহি—স্কন্ধে গরু বাঁধিবার দড়ি। স্ফুট…শোভা—শ্রীদামের রূপ প্রস্ফুটিত চম্পকের অপেক্ষা উজ্জ্বল।

৬। ভালে—কপালে। দাড়াঞা—দাঁড়াইয়া (অপেক্ষা করিতেছে)। বিশাল…অংশুমান্—সখাদের নাম।

৭

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে বাজা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিও ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

৮

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥

৭। বিহি—বিধাতা। তেঞি—সেই জন্য।
বাধা—পাদুকা, খড়ম। পদকর্তা রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, আমরা পথে তোমার গোপালের পাদুকা যোগাইয়া দিব, তাহার পায়ে কুশাঙ্কুরচিত বিঁধিবে না।

৮। শপতি—শপথ, দিব্য।
শ্রীদাম......পাছে—'মাঝে তার যাইওরে কানাই'—পাঠান্তর। রিপু-ভয়—শত্রুর ভয়।
তুমি......আছে—'তৃষ্ণা হলে চেয়ো বারি বলাই ধরিবে ঝারি
নামিও না যেন যমুনায়।' —পাঠান্তর।

ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও   পথ-পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু   ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায়   মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও   বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

৯

দণ্ডে শতবার খায়   যাহা দেখে তাহা চায়
ছানা দধি এ ক্ষীর-নবনী।
রাখিও আপন কাছে   ভোকছানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি॥
শুন বাপ হলধর   এক নিবেদন মোর
এই গোপাল মায়ের পরাণ।
যাইতে তোমার সনে   সাধ করিয়াছে মনে
আপনি হইও সাবধান॥
দামালিয়া যাদু মোর   না জানে আপন পর
ভাল-মন্দ নাহিক গেয়ান।
দারুণ কংসের চর   তারা ফিরে নিরন্তর
আপনি হইও সাবধান॥

চাহি—ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া।
কারু…কানু—কাহারও কথায় বড় গরুগুলি চরাইতে যাইও না।
হাত……মাথে—আমার মাথায় হাত দিয়া ঐ সকল কথা দিব্য করিয়া বল।
রবি—রৌদ্র।
পানই—পাদুকা; 'পানই' শব্দ 'উপানৎ' হইতে আসিয়াছে; উপানৎ—জুতা।
৯। ভোকছানি লাগা—ক্ষুধা তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া খারকর হওয়া।
দামালিয়া—দামাল, দুরন্ত, অস্থির।

বাম করে হলধর　　দক্ষিণ করে গিরিধর
শুন বলাই সাবধান-বাণী।
বাসুদেব দাস বলে　　তিতিল নয়ন-জলে
মুরছিয়া পড়িল ধরণী॥

১০

প্রণতি করিয়া মায়　　চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু　　গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সবার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল　　পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম　　দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব　　আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে　　নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে　　কেহো কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো গান গায়।
এ দাস মাধব বলে　　কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম-কানাই আনন্দে খেলায়॥

হলধর—বলরাম।　　গিরিধর—শ্রীকৃষ্ণ; যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন
বাম করে......সাবধান-বাণী—কৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েই অসীম শক্তিশালী; উহাদের জন্য যশোদার ভয় ও উৎকণ্ঠায় কবি বেশ একটু স্নিগ্ধ কৌতুক অনুভব করিতেছেন।
তিতিল—সিক্ত হইল, ভিজিল।
১০। ব্রজ-বাল—ব্রজের বালক।　　শবদ—শব্দ।
রোল—ধ্বনি।　　বৃষ-ছান্দে—বৃষের ভঙ্গিতে।

১১

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলি-খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেল
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলী শাঙলী আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা-হার
বদনে মদন-ভান রি।
আগম-নিগম-বেদ-সার
লীলায় করত গোঠ-বিহার
নসিরমামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি॥

১২

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥
অশোক-পল্লব-করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥

১১। পাঁচনি—গোচারণের যষ্টি। কাচনি—লড়ি। খুরলী—অভ্যাস।
মুরলী-খুরলী গান রি—মুরলীতে অভ্যাস করা গান (বাঁশীতে সাধা গান) গাহিতেছে।
তরণি-তনয়া—সূর্যকন্যা, যমুনা।
বদন……কাঁতি—মুখখানি চাঁদের ন্যায় এবং কান্তি মেঘের মত।
চারু-চন্দ্রি—সুন্দর শিখিপুচ্ছ-চূড়া। ভান—দীপ্তি, শোভা। মদন-ভান—মদনের দীপ্তি।
আগম……বিহার—আগম-নিগম-বেদের যিনি সার, অর্থাৎ মূল প্রতিপাদ্য, সেই অখিল বিশ্বের আদিকারণ বিরাট্ পুরুষ আজ লীলার ছলে সামান্য রাখালবেশে গোষ্ঠবিহার করিতেছেন।

স্তোক-কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্ করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী
দাম সুদাম নাচে গায়॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

১৩

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু উৰ্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু-রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥

১২। স্তোক-কৃষ্ণ—কৃষ্ণের জনৈক সখা। বটু—ব্রাহ্মণ-বালক, এখানে মধুমঙ্গল। কৃষ্ণসখাদের মধ্যে ইনিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণ রাখাল-রাজা সাজিলে মধুমঙ্গলই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাজ পরিতেন।
১৩। গো-ক্ষুর-রেণু—গরুর ক্ষুরের আঘাতে উত্থিত ধূলিরাশি।
আবা আবা—ক্রীড়া স্থগিত রাখার সঙ্কেত-সূচক শব্দ-বিশেষ।

কালিয়দমন

১৪

কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহাঁ রহে
বিষ-জল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উগলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষ-জ্বালা সহিতে না পারে॥
দেখি যদুনন্দন দুষ্ট-সর্প-বিনাশন
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালসাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালী-দহ-জলে॥
দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল-মন
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঞা॥
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু-বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানি
বাঁধব অবনী গড়ি যায়॥

১৫

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু-বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়॥

১৪। দহে—নদীর কোন অংশের চারিদিক্ শুকাইয়া যে একটা জলাশয় থাকিয়া যায়, তাহাকেই দহ বলে। বড় হইলে উহা হ্রদ নামে অভিহিত হয়।

দহন—অগ্নি। পাঞা—পাইয়া। ফুকরি—চীৎকার করিয়া

থির নাহি বান্ধে—মন স্থির করিতে পারে না। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে

পাষাণ…পানি—পাষাণ দ্রব হইয়া জলে পরিণত হইল। গড়ি—গড়াগড়ি

নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এপনি উঠিছে কালী-দমন করিয়া॥

১৬

ব্রজবাসিগণ-জীবন শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন-বেশ॥
কালিয়-ফণায় নটন রঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন-সঙ্গ॥
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান॥
ফণায় ফণায় দমন করি।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগরে অনল-সমান বিষ॥
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি।
ভুঞ্জয়ে চরণ-নখর-শশী॥
নাগাঙ্গনাগণকরয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজমণি হরিষ-মতি॥
ফণিপতি অতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ নিত॥
ফণিপতি বরে অভয় করি।
জল সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ-সাগরে॥

১৬। নটন—নৃত্যশীল।
হেরি…সঙ্গ—তাহা দেখিয়া যেন (জনু) দেহ পুনরায় জীবনের সঙ্গে একত্র হইল, অর্থাৎ দেহে প্রাণ আসিল।
মরণ-শরীরে—মৃতদেহে।
হেরিয়া…মান—তাঁহাকে দেখিয়া সকলে (সবহুঁ) এইরূপ মনে করিলেন (মান) যে, তাঁহাদের মৃতদেহে পুনরায় প্রাণ আসিল।
ঐছন—ঐরূপ।
ভুঞ্জয়ে—ভোগ করে। সর্প-রাজের মাথার উজ্জ্বল মণিগণ খসিয়া পড়িল। সর্প-রাজ মণিহারা হইয়াও কৃষ্ণনখ-চন্দ্রের শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া সেই সুখই উপভোগ করিতে লাগিল।
বরে—বরদান দ্বারা। সঞে—হইতে। কোরে—ক্রোড়ে, কোলে

১৭

ব্রজ-নিজ জন হেরি আনন্দ-চন্দ।
হেরই তৃখল চকোরক-ছন্দ॥
কাহুক বয়ানে না নিকসয়ে বাত।
কর-সরসীরুহে মাজই গাত॥
বিষ-জলে জনু দাহন ভেল।
ব্রজ-প্রেমামৃতে শীতল কৈল॥
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহু আলিঙ্গয়ে গদ-গদ-ভাষ॥
সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক॥
পূরল মনোরথ দরশ-রস-পানে।
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে॥
খিন্নকুল আকুল আনন্দে ভাস।
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস॥

১৭। ব্রজ-নিজ-জন···ছন্দ—ব্রজবাসী স্বজনগণ (ব্রজ-নিজ-জন) শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র (আনন-চন্দ) দেখিয়া (হেরি) পিপাসিত (তৃখল) চকোরের মত (ছন্দ) তাকাইয়া রহিল (হেরই)।

কাহুক—কাহারও। না নিকসয়ে—বাহির হয় না। বাত—কথা।

কর···গাত—তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গায়ে (গাত) পদ্মতুল্য কোমল হস্ত (কর-সরসীরুহ) বুলাইতে লাগিল (মাজই—মার্জনা করিতে লাগিল)। ব্রজবাসীদের মনের অবস্থা তখন এরূপ যে ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তাহারা নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে নিজেদের কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বিষ-জলে···কৈল—বিষাক্ত জলে (বিষ-জলে) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত (জনু) হইতেছিল, ব্রজবাসীদের প্রেমামৃত তাহা শীতল করিল (কৈল)।

যৈছন···সম্ভাষ—যে যেরূপ সম্ভাষণের যোগ্য, তাহাকে সেইরূপে সম্ভাষণ করিলেন।

সহচরীগণ···দেখ- সহচরীগণ তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিল।

ঈষদব···অভিষেক—আবার (প্রেমপূর্ণ) কটাক্ষ (অপাঙ্গ-দৃষ্টি) দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিল।

সুবদনী—সুমুখী। এখানে শ্রীরাধা। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

চতুর্থ স্তবক

শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ

১

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ　　কে দিল ময়ূর-পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা　　ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী-মালে　　গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি　　বহিতেছে সুরধুনি
নীল গিরি-শিখর বাহিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ　　চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিলে কাগু রঙ্গিয়া।
রজতের পাতে কেবা　　কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥

১। আকাশ···শোভা—শ্রীকৃষ্ণের উচ্চচূড়াস্থিত ময়ূর-পুচ্ছের দিকে চাহিয়া মনে হয়, বুঝিবা আকাশের দিকে চাহিয়া নব-মেঘে ইন্দ্রধনুর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি।

মল্লিকা···বাহিয়া—মোহনচূড়া বেড়িয়া থরে থরে মালতীর মালা ঝুলাইয়া দিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন সুরধুনীর ধারা বহিতেছে। হিমগিরি হইতেই গঙ্গার উদ্ভব, কিন্তু আমি দেখিতেছি, নীলগিরি হইতে গঙ্গার ধারা বহিতেছে।

কালার কপালে···কাগু রঙ্গিয়া—শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত ললাট জুড়িয়া সারি সারি চন্দনের টিপ এবং তাহার মাঝে মাঝে কাগুর বিন্দু। যেন কোন ভাগ্যবতী রজতের আধারে জবাফুল দিয়া যমুনার কাল জলে ভাসাইয়া দিয়াছে (যমুনা দেবীর পূজার জন্য)।

হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়েছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম-রূপ দেখি ধীরে ধীরে॥

২

মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ
মধুপ-শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ
মালতী ফুল-মাল রঞ্জ
অঞ্জন-যুত কঞ্জ-নয়নী
খঞ্জন-গতি-হারী॥
কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কয়কঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী॥
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিয়দমন-দমন-রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীল শাড়ী॥

হিঙ্গুল···করবীরে—শ্রীকৃষ্ণের কাল অঙ্গে রক্তবর্ণ হিঙ্গুল গুলিয়া কে ছিটাইয়া দিয়াছে। তাহাতে মনে হইতেছে, কে যেন রক্তকরবী দিয়া কৃষ্ণ সলিলা যমুনার পূজা করিয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের কাল অঙ্গের ঠাঁই ঠাঁই লাল (যথা, অধরে করতলে ইত্যাদি)। মনে হয় যেন কেহ রক্তকরবী দিয়া যমুনার পূজা করিয়াছে।

শ্যাম-রূপ···ধীরে ধীরে—পদকর্ত্তার মনে হইতেছে, নানাবর্ণ-বিভূষিত এই অনুপম রূপ এক-নজরে দেখিবার বস্তু নয়, ইহা ধীরে ধীরে রহিয়া-বসিয়া উপভোগ করিবার সামগ্রী।

২। মঞ্জু—সুন্দর।

গুঞ্জ—গুঞ্জনধ্বনি। এখানে শ্রীরাধার চরণের নূপুর-গুঞ্জনধ্বনি।

গঞ্জি—গঞ্জনা করিয়া, লাঞ্ছিত করিয়া। কুঞ্জর-গতি—গজ-গতি।

মঞ্জুল—সুন্দর। রঞ্জ—রঞ্জক, রাগজনক, প্রীতিজনক।

অঞ্জন-যুত—কজ্জলযুক্ত। কঞ্জ-নয়নী—পদ্মপলাশলোচনা।

নাচত···দমন-রঙ্গ—কালিয় নামক ভয়ঙ্কর বিষধর ভুজঙ্গকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, সেই ভুজঙ্গ-দমন শ্রীকৃষ্ণকেও দমন করিতে পারে এমন রঙ্গ (অর্থাৎ ক্রীড়াকৌশল) প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার কটাক্ষপূর্ণ নয়নের ভ্রূ-ভুজঙ্গ-যুগল (ফণা তুলিয়া) নাচিতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাইলেই যেন দংশন করিবে।

দশন কুন্দ-কুসুম নিন্দু
বদন জিতল শারদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু চরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু পারী ॥
অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনানন্দ
নন্দন সুখকারী ॥
মণি-মানিক নখে বিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ
চরণকি বলিহারি ॥

বিন্দু…ঘরমে—পথ চলার শ্রমের ফলে শ্রীরাধার অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।
থল-জলরুহ—স্থলের জলরুহ (পদ্ম)। পদ্ম জলেই শোভা পায়, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্ম কিন্তু স্থলেই শোভা পাইতেছে।

পঞ্চম স্তবক

পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ

১

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

১। এই কবিতাটিতে প্রথমতঃ নাম শোনার প্রসঙ্গ। সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ নামের মাধুর্য্য—ইহাও ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়তঃ নাম-জপ (মন্ত্রস্ত মূলমুচ্চারো জপঃ)—ইহাও ভগবৎ-প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না।

পরতাপে—প্রতাপে।

ঐছন—এইরূপ ('অবশ')। শুধু নামের প্রতাপে অর্থাৎ নাম জপ করিতে করিতে যখন আমার অঙ্গ এইরূপ অবশ হইয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়।

নয়নে দেখিয়া গো—সেই নামের বসতি যেখানে অর্থাৎ যে দেহে, সেই দেহ বা রূপ দেখিয়া যুবতী-ধর্ম্ম (সতীত্ব) কেমন করিয়া থাকে? পাঠান্তর—'সেখানে থাকিয়া গো।'

আপনার যৌবন যাচায়—কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাধ্বী রমণীগণ সেই নাম শুনিয়া এবং রূপ দেখিয়া আপন আপন রূপ-যৌবন সাধিয়া দান করে।

সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমে যে অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভগবৎ-প্রেমের উন্মাদনা ও সর্ব্বপ্রকার আত্মাভিমান-বিলয়ের জাগতিক উদাহরণ। এই ধারণাই 'পূর্ব্বরাগে'র ও অনুরাগে'র কবিতাগুলির মূলে নিহিত রহিয়াছে।

২

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে ॥

২। এই পদে চণ্ডীদাস রাধার পূর্ব্বরাগের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইতেই মহাপ্রভু একা নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন—চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ধেয়ানে—ধ্যানে।

না চলে……তারা—মেঘ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই নিশ্চলভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। তুলনীয়

"মাধবেন্দ্র পুরী-কথা অকথা কথন।
মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন।" —চৈতন্যভাগবত।

বিরতি আহারে—যতি-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে উপবাস। মহাপ্রভু প্রথম প্রেমাবেশে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাঙ্গাবাস পরে—গেরুয়া রঙের কাপড় পরিধান করে—রাধা নীলাম্বরই পরিতেন, কিন্তু যোগিনীর মত এক্ষণে বেশভূষার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। এখানে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই সকল পদে চণ্ডীদাস মহাপ্রভু "আগমনী" গান করিয়াছেন।

যেমত যোগিনী-পারা—এখানে ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট।

এলাইয়া……চুলি—ফুলের গাঁথনি খুলিয়া ফেলিয়া চুলের বর্ণ নিবিষ্টভাবে দেখিতে থাকেন; কারণ, তাহাতে কৃষ্ণের বর্ণ দেখিতে পান।

চুলি—চুল।

একদিঠ……নিরীক্ষণে—ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ আছে—একজন্য একদৃষ্টে তাহা দেখিতে থাকেন।

৩

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে॥

৪

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরুছা পায়॥

৩। তিলে তিলে—মুহূর্তে মুহূর্তে। উচাটন—উদ্বিগ্ন। দুরজন—দুর্জন।
গুরু···পাইল—গুরুজনকে ভয় করে না, দুর্জনের নিন্দাবাদে ভয় নাই, কোন দেবতা বোধ হয় ইহাকে পাইয়া বসিয়াছেন।
তাহার চরিতে..চাঁদে—তাহার চরিত্র দেখিয়া এমন মনে হয় যে সে চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, অর্থাৎ অতি দুর্লভ কোন সামগ্রী পাওয়ার জন্য আশা করিয়াছে।
৪। ঢল ঢল····অবনী বহিয়া যায়—ঢল ঢল কাঁচা (তরল) অঙ্গ-কান্তি যেন ভূতলে বহিয়া চলিয়াছে, অর্থাৎ সে অপরূপ তরলতাপূর্ণ লাবণ্যে যেন পৃথিবী ভাসাইয়া দিল।
হিলোলে—হিল্লোলে। মদন মূরুছা পায়—স্বয়ং মদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥

২

সহজই বিষম অরুণ-দিঠি তাকর
আর তাহে কুটিল কটাখ।
হেরইতে হামারি ভেদি উর-অন্তর
ছেদল ধৈরজ-শাখ॥

ধরয—ধৈর্য্য। বেয়াকুল—ব্যাকুল। ঝুরে—কাঁদে
বিষম বিশিখে—দারুণ শরে। মাতল—উন্মত্ত। বুলে—ভ্রমণ করে।
২। দিঠি—নয়ন। তাকর—তাহার। কটাখ—কটাক্ষ। ভেদি—ভেদ করিয়া।
উর-অন্তর—বক্ষের অন্তস্তল। ছেদল—ছেদন করিল। ধৈরজ-শাখ—ধৈর্য্যের শাখা।
সহজই····শাখ—একে ত আপনা হইতেই তাঁহার রাগারুণ নয়ন দুটি দুঃসহ। তাহার উপর আবার বক্র কটাক্ষ। আমার পানে চাহিবামাত্র (সে কটাক্ষ) আমার বক্ষের অন্তস্তল ভেদ করিয়া আমার ধৈর্য্যের শাখা ছেদন করিল।

এ সখি, বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সজল জলদ-রুচি দেহ॥
মৃদু মৃদু ভাখি হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই রহ পুন ভাগি॥
তহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি ঐছন
আনহ হৃদয়ক মাঝ॥

৬

কি পেখলু বরজ- রাজ-কুলনন্দন
রূপে রহল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥

এ সখি...দেহ—সখি, এই যে বিহার করিতেছেন, ইনি কে? সজল মেঘের লাবণ্য ইঁহার দেহে। তাহাতে আবার পীত-বসন পরিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ বিরাজ করিতেছে।

উপজায়ল—উৎপাদন করিল। মনসিজ-আগি—কামাগ্নি।

মৃদু মৃদু···আগি—মৃদু মৃদু সম্ভাষণ এবং হাস্যের দ্বারা আমার অন্তরে দারুণ কামানল জ্বালাইয়া তুলিল।

হেরই—দেখে। রহ পুন ভাগি—কিন্তু দূরে থাকে, অর্থাৎ অগ্রসর হইতে পারে না।

যাকর..ভাগি—যাহার (যে কামাগ্নির) ধূমে কুলরমণী ধর্মপথ দেখিয়াও অগ্রসর হইতে পারে না।
শ্রীরাধা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের কুটিল কটাক্ষ তাঁর ধৈর্য্যের শাখা ছেদন করিয়াছে। এখন সেই কাঁচা ডালে আগুন লাগায় ধোঁয়ায় চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

তহিঁ পুন..লাজ—তাহার উপর আবার কুলকামিনীর কুলগর্ব্ব এবং লজ্জা পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিবার জন্য অধরে বেণু ধরিয়া তাহাতে ফুঁ দিতেছে অর্থাৎ ফুঁ দিয়া অগ্নিকে আরও প্রবল-ভাবে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে।

'বেণু অধরে ধরি ফুকরই'—ইহার দুই অর্থ—(১) বেণুতে ফুঁ দিতেছে অর্থাৎ বাঁশী বাজাইতেছে। (২) বাঁশের চোঙ্গায় ফুঁ দিয়া অগ্নিকে প্রবলতর তেজে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে।

ঐছন—ঐরূপ। আনহ—অন্যেরও, অপর পক্ষেরও অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরও।

কহ..মাঝ—পদকর্ত্তা বলিতেছেন—সুন্দরি, এরূপ অবস্থা শুধু তোমারই হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ একই অবস্থা।

৬। বরজ—ব্রজ। রূপে রহল পরাণ—রূপে প্রাণ লাগিয়া রহিল।

নিরমিয়া—নির্ম্মাণ করিয়া।

একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন-অভরণ
কিরণহি ভূবন উজোর।
দরপনে লোচন লোরে অগোরল
না চিহ্নলু কাল কি গোর ॥
সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জ-দল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি মাঝে ॥
সরস কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখলু
দেখিয়া অনন্ত দাস ॥

৭

আলো মুঞি জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া ॥

কিরণহি—কিরণেতে। **উজোর**—উজ্জ্বল।
অগোরল—আগ্‌লাইল, অবরুদ্ধ করিল। **চিহ্নলুঁ**—চিনিলাম। **সহজে**—স্বভাবতঃ।
দৃগঞ্চল—নেত্র-প্রান্ত। **কঞ্জ-দল**—পদ্ম-দল, পদ্মের পাপড়ি।
অলখিতে—অলক্ষ্যে। **লোল**—চঞ্চল; দোদুল্যমান। **ঝাঁপল**—ঢাকিল।
দিনকর-ভাস—সূর্য্যের দীপ্তি। **লাবণি**—লাবণ্য। **দিঠি**—দৃষ্টি, নয়ন।
৭। **যৌবনের……গেল**—যৌবনের স্বপ্ন-কাননে প্রবেশ করিয়া আমার এই রূপমুগ্ধ চিত্ত বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না,—রূপের গোলকধাঁধাঁয় ঘুরিয়া মরিতেছে।
অফুরান—যাহা ফুরায় না, অনন্ত।
ঘরে……অফুরান—ঘরে ফিরিবার পথ আজ আমার নিকট অনন্ত বলিয়া মনে হইতেছে অর্থাৎ সংসার এবং আমার মধ্যে আজ অনন্ত ব্যবধান রচিত হইল।
রসনা—কটি-ভূষণ-বিশেষ। **জড়া**—জড়িত। **কোঁড়া**—কুঁড়ি, অঙ্কুর।

জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু-কুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

৮

সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী সেইকালে পড়িল রূপের জালে
বাঁশী-ফাঁসি গলায় লাগিল॥
ধৈর্য্য-শীল হেমাগার গুরু-গৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীরব-বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়॥
(আমার) চিত্তশালে মত্ত হাতী বাঁধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে॥

ঘোষণা—প্রচার ; এস্থলে কলঙ্ক-প্রচার। দঢ়—দৃঢ়।

৮। নন্দের নন্দন......তলে—নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ হইয়া কদম্ব-বৃক্ষের তলায় রূপের ফাঁদ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

দিয়া হাস্য...পড়িল—ব্যাধ যেমন প্রলোভনজনক চার দিয়া ও নলে আঠা মাখাইয়া পাখী ধরে, কৃষ্ণ ঠিক তেমনি করিয়া হাস্য-সুধার চার ফেলিয়া ও অঙ্গকান্তির আঠা দিয়া আমার নয়ন পাখীকে ধরিয়াছে।

ধৈর্য্য-শীল-হেমাগার......তায়—আমার চিত্ত ধৈর্য্য এবং শিষ্টাচারের হেম-ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ধন-ভাণ্ডারের সিংহদ্বার ছিল গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাবোধ এবং তাহার কপাট হইয়াছিল ধর্ম্ম।

বংশীরব-বজ্রাঘাতে......আমায়—শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবের বজ্রাঘাতে আমার সেই ধন-ভাণ্ডার অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমায় একেবারে সকল দিক্ হইতে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। অথবা আমার আমিত্ব-বোধকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিল।

চিত্তশালে......উদ্দেশে—আমার চিত্তশালায় মাৎসর্য্যের মত্ত মাতঙ্গ কুলগর্ব্বের শিকল দিয়া বাঁধা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ-অঙ্কুশের আঘাতে আজ শিকল কাটিয়া কোথায় যে ছুটিয়া পালাইল, তাহার আর উদ্দেশ পাইলাম না।

কালিয়া কুটিল বাণে কুল-শীল কোন খানে
ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস।
প্রাণমাত্র আছে বাকী তাও বুঝি যায় সখি
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥

৯

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঙ্গে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ-পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥

কালিয়া…বাস—শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ কুটিল বন্যার মত আমার কুল-শীল সব কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। আজ হইতে আমার ব্রজের বাস উঠিল।

৯। এইটি এবং ইহার পরেরটি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদ।

যাঁহা যাঁহা—যেখানে যেখানে। নিকসয়ে—নিঃসৃত হয়। তনু—ক্ষীণ, কৃশ। তনু—দেহ। তাঁহা তাঁহা—সেখানে সেখানে। বিজুরি—বিদ্যুৎ। চমকময় হোতি—চমকায়। চল—চঞ্চলভাবে। চলই—চলিয়া যায়। থল-কমল-দল—স্থলপদ্মের দল। খলই—(যেন) স্খলিত হয়।

দেখ সখি কো ধনি…খেলি—হে সখি দেখত, এ কোন্ রমণী যে সহচরীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার জীবন লইয়া খেলা করিতেছে।

ভাঙুর—বঙ্কিম। ভাঙ্—ভ্রূ। মুগধল—মুগ্ধ হইল।

চিনলহুঁ…জান—মুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া রাধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছে না।

১০

সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ কুসুম জনু তনু-রুচি
দিনকর-কিরণে মৈলান॥
সজনি, সো ধনি চিতক চোর।
চৌরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহু পাদুক করি নেল॥
চিত-নয়ন মঝু দুহু সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

১১

বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতর শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥

১০। সিনান—স্নান। মৈলান—ম্লান। চিতক চোর—চিত্ত-চোর।
চৌরিক পন্থ—চুরির পথ, চৌর্য্য-পন্থা। ভোরি—বিভোর করিয়া, জ্ঞানশূন্য করিয়া।
নয়নক ওর—নয়নের প্রান্ত, কটাক্ষ, অপাঙ্গ-দৃষ্টি। বালুক বেল—বালুর বেলা, যমুনা-সৈকত।
কোমল চরণ…করি নেল—শ্রীরাধার সুকোমল পদদ্বয় মন্থর গতিতে সাবধানে চলিতেছে, কারণ যমুনা-সৈকত প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সেই মন্থরগামী চরণদুটির পানে চাহিবামাত্র শ্রীরাধা আমার সজল বিমুগ্ধ নয়ন-পদ্মদুটিকে তাহার পাদুকা করিয়া লইল অর্থাৎ সেই সুকোমল পদদ্বয়ে আমার বিমুগ্ধ চক্ষুদুটি পাদুকার মত সংলগ্ন হইয়া রহিল। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ প্রথম দর্শনেই এত প্রবল যে, উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া চলিবার সময়ে রাধার কষ্ট হইতেছে ইহা ভাবিয়া মনে মনে নিজের চক্ষুদুটিকে পাদুকা-রূপে কল্পনা করিতেছেন।
চিত্ত…চোরায়লি—চিত্ত এবং নয়ন দুই-ই সে চুরি করিল।
শূন…মান—হৃদয় এখন শূন্য বলিয়া মনে করিতেছি। জারত—দগ্ধ।
১১। জলের…রায়—যমুনার জলে শ্যামের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধা শ্রীরাধা ভাবিতেছেন যে, জলের ভিতরে তিনি লুকাইয়া আছেন।

যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যাম রায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে
হেরিয়া সে কুল রাখা দায়॥
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হৈলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু॥
কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।
হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি
সেই দুখে হৃদয় বিদরে॥
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ-ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে॥

১২

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখি হে, অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজি অগুসরি সকরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥

জল…কানু—তরঙ্গ উঠিলে প্রতিবিম্ব অদৃশ্য হইতেছে; আবার জল স্থির হইলে দেখা যাইতেছে।
বসু…বাণী—'চণ্ডীদাসের বাণী'—পাঠান্তর।
১২। নহাই—স্নান করিয়া।
গুরুজন…বয়ান—গুরুজনের সঙ্গে রাই চলিয়াছে কাজেই লজ্জায় নতমুখী; —কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিবে।
সখি হে…ফেরি—এক সখী অন্য সখীকে বলিতেছে—সখি, রাধার অপূর্ব্ব চাতুরী। সকলকে ত্যাগ করিয়া আগাইয়া গিয়া সে বদন আড় করিয়া ফিরাইল।

তঁহি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরশ ধনি লেল॥
নয়ন-চকোর কাহ্ন-মুখ-শশিবর
ক-এল অমিয়-রস-পান।
দুহুঁ দুহুঁ দরশনে রসহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

১৩

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সাঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাখি॥

তঁহি পুন—তাহার পর আবার। তোড়ি—ছিঁড়িয়া।
ফেকল—ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। কহত—কহিল।
চুনি—কুড়াইয়া। সঞ্চরু—ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।
তহি পুন…লেল—তাহার পর আবার মোতিহার ছিঁড়িয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল (যাহাতে কুড়াইতে বিলম্ব হয়)। বলিল, আমার হার ছিঁড়িয়া গেল। তখন সকলে এখান-সেখান করিয়া হেটমুখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া একটি একটি করিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। সেই ফাঁকে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লইল।
পসারল—প্রসারিত হইল।
১৩। কএ—করিয়া। রহলিহুঁ—রহিলাম। বারল—বারণ করিলাম। পিবএ—পান করিতে।
অবনত…চকোর—আমি বদন অবনত করিয়া রহিলাম এবং আমার লুব্ধ লোচন-চোরদুটিকে নিবারণ করিলাম অর্থাৎ আমার চোখদুটি পাছে চুরি করিয়া ফাঁকি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লয়, সেই ভয়ে মুখ তুলিলাম না। কিন্তু তাহারা বাধা মানিল না। চকোর যেমন চাঁদের সুধা পান করিবার জন্য ছুটিতে থাকে, আমার চোখদুটি সেইরূপ প্রিয়তমের মুখ-রুচি পান করিবার জন্য ধাবিত হইল।
ততহুঁ সঞো—সেই স্থান হইতে। হঠ—হঠকারী, গোঁয়ার, একগুঁয়ে। হটি—হটাইয়া, ফিরাইয়া।
ততহুঁ…পাখি—সেই স্থান হইতে সেই একগুঁয়ে নয়নদুটিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া আমার চরণে ধরিয়া রাখিলাম অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি চরণে স্থাপিত করিলাম, অর্থাৎ দৃষ্টি নত করিলাম। মধু পান করিবার পর মত্ত ভ্রমর উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে, অর্থাৎ উড়িবার জন্য ছটফট করিতে থাকে, তেমনি আমার রূপমুগ্ধ নয়ন উড়িবার শক্তি হারাইয়াও পক্ষ বিস্তার করিতে ছাড়িল না।

মাধব বোলল মধুর বাণী
সে শুনি মুন্দু মোঞে কাল।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাচবাণ॥
তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু-বলয়া ভাগু॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল না যায়।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
শ্যামসুন্দর—কায়॥

১৪

একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥

মাধব……পাঁচবান—মাধব মধুর বাণী বলিলেন, আমি তাহা শুনিয়া কর্ণ মুদিলাম অর্থাৎ হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিলাম। সেই অবসরে অর্থাৎ কানে হাত চাপা দিতে যেটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে সেইস্থানে মদন ধনু ধরিয়া আমার বৈরী হইল, অর্থাৎ শরাঘাতে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

পসেব—প্রস্বেদ, ঘাম। পসাহনি—প্রসাধনী, অঙ্গরাগ। তৈসন—সেইরূপ, তেমনই অধিক।

তনু-পসেবে……ভাগু—দেহের ঘামে অঙ্গরাগ ধুইয়া ভাসিয়া গেল। দেহ এত অধিক পুলকিত হইল যে চুন চুন শব্দ করিয়া কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল এবং বাহুর বলয় ভগ্ন হইল।

হো—হয়।

ভণ……যায়—বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কর কম্পিত হইতেছে, কথা আবেগ-রুদ্ধ হইতেছে।

১৪। অকথন—যাহা কহা যায় না, অর্থাৎ যাহা কথায় বুঝান যায় না।

গড়ি যায়—গড়াগড়ি যায়, লুটাইয়া যায়।

১৫

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহু কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহাঁ হোয়॥

১৬

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্‌যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥

১৫। হাথক—হাতের। দরপণ—দর্পণ। মাথক—মাথার।
মৃগমদ—কস্তুরী-লেপন। গীমক—গ্রীবার। সরবস—সর্বস্ব।
পাখীক—পাখীর। দুহুঁ—দুইজনে।

তুহুঁ কৈছে……হোয়—রাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার পক্ষে হাতের দর্পণ-স্বরূপ (পূর্বকালে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা মুখ দেখিবার জন্য সর্বদা হাতে দর্পণ রাখিতেন, সেটি তাঁহাদের বড় প্রিয় জিনিস ছিল। উড়িষ্যা ও অপরাপর স্থলে পাথরে রচিত ও অঙ্কিত অনেক নারী-মূর্তির হাতে দর্পণ দৃষ্ট হয়। বিবাহের কালে বরের হাতে অনেক স্থলে দর্পণ দেওয়া হয়)। মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, বক্ষের মৃগমদ চিত্রপাতি, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পক্ষ, মৎস্যের জল, জীবের জীবন; অর্থাৎ তুমিই আমার সব। কিন্তু তোমাকে এত ভালবাসিয়াও তুমি যে কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। (ভক্ত ভগবানকে এত গভীরভাবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াও তাঁহার বিরাট রহস্যের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় ভাবে মনে ভাবেন—তিনি কে? এত করিয়াও তাঁহার তত্ত্ব তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।) তুমি তো আমার সব—কিন্তু হে মাধব, তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। বিদ্যাপতি বলেন, তোমরা দুইজনে দুই-জনেরই মত; অর্থাৎ ভগবান্ যেমন অসীম, ভক্তের প্রেমও তেমনই অসীম।

১৬। আঁখি ঝুরে—চোখের জল পড়ে। আরতি—ব্যগ্রতা, ঐকান্তিকী ইচ্ছা।
আরতি নাহি টুটে—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥

১৭

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥

দরশ…গা—দর্শন এবং স্পর্শের আশায় শরীর এলাইয়া পড়িতেছে। পহু—প্রভু।
গুরু-গরবিত মাঝে—গুরু ও পূজনীয়গণের মধ্যে। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে…পরকার—দেহে যাহাতে রোমাঞ্চ-প্রকাশ না হয়, তজ্জন্য কত চেষ্টা করি। পরকার—প্রকার, উপায়; কিন্তু প্রবহমান অশ্রু আমার সমস্ত লুকাইবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।
লাজ-ঘরে…আগুনি—লজ্জা ও গৃহের মুখে আগুন (আগুনি) জ্বালাইয়া দিলাম (ভেজাই)।
১৭। কোর—ক্রোড়, কোল, আলিঙ্গন।
দুহুঁ কোরে…ভাবিয়া—অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদের দূরত্ব অনুভব করিয়া উভয়ে দুঃখিত হয়।
ভানু…রয়—সূর্য্য এবং কমলের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কথা আমরা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় সে ভালবাসা কিছুই নয়; কারণ, শীতের সময় পদ্ম যখন মরিয়া যায় সূর্য্য তখনও দিব্য সুখে থাকে। যে প্রেমে একজন আর একজনের সুখ-দুঃখকে নিজের করিয়া লইতে না পারে, সে প্রেমের সহিত এ প্রেমের কিরূপে তুলনা হইতে পারে?
চাতক…কণা—চাতক এবং মেঘের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কথা আমরা বলিয়া থাকি, কিন্তু এ প্রেমের সহিত তাহারও তুলনা হয় না; কারণ, বর্ষাকাল না আসিলে মেঘ চাতককে এক বিন্দু জল দেয় না, অর্থাৎ এ প্রেম সাময়িক, নিত্যকালের নয়।

কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে ভুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥
কি ছার চকোর-চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

১৮

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ॥
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয় হাস।
তহি এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস॥

কুসুমে…ফুল—পুষ্প এবং ভ্রমরের ভালবাসার কথা কবিরা বলিয়া থাকেন, তাহাও ইহার কাছে কিছুই নয়; কেন না, ভ্রমর ফুলের নিকট আসিলে তবে সে মধু পায়;—ফুল নিজে গিয়ে তাহাকে মধু দিয়া আসে না, অর্থাৎ এ প্রেমে দুজনের সমান আগ্রহ নাই।

১৮। রূপে…দিঠি—(শ্যাম) রূপে আমার নয়ন (দিঠি—দৃষ্টি) পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সোঙরি…অঙ্গ—সেই মধুর স্পর্শ স্মরণ করিয়া আমার অঙ্গে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চ হইতেছে।

না…পরসঙ্গ—আমার কানে সর্ব্বদাই সেই বাঁশী বাজিতেছে; অন্য কথা (প্রসঙ্গ) সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।

লব-লেশ…কণামাত্র। লব—লেশ, কণা।

নাসিকাহো—নাসিকাও।

নব…ঠাম—নূতন নূতন গুণরাশি আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে ধর্ম্মের আর স্থান হইবে কোথায়?

অন্তরে…হাস—আত্মীয় স্বজনের তর্জন-গর্জনে আমার শুধু হাসি পায় (তাহারা ত জানে না যে, আমার চিত্ত আমার বশে নাই)।

তহি…অনুরত—একমাত্র কামনা এই যে, তিনি যদি আমার প্রতি অনুরক্ত, প্রীতিমান্ হন।

১৯

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হলা পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় ছুলিয়া ছুলিয়া॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥
এ সকল সখা হলা কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন বটে দু-পাণি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥

২০

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥

১৯। ধরণী…নাচিয়া—এখানকার মৃত্তিকার কি সৌভাগ্য,—আমার বঁধু নাচিয়া নাচিয়া ইহাতে পা ফেলিয়া যান।
নূপুর…সোনা—স্বর্ণ কি পুণ্যবলে তাঁহার নূপুরের রূপ ধারণ করিয়াছে?
পুষ্প…করিয়া—কি পুণ্যবলে এখানকার ফুলগুলি বনমালায় গ্রথিত হইয়া তাঁহার গলে দুলিতেছে? সর্বঋতুতে যে সকল ফুল প্রস্ফুটিত হয় সেই সকল ফুলে গাঁথা আজানুলম্বিনী মালাকে বনমালা বলে। ইহার মধ্যস্থলে কদম্ব ফুল থাকে।
মুরলী…করিয়া—বংশ কি পুণ্যবলে বংশী হইয়াছে?
বাজে…খাইয়া—যে পুণ্যে ইহা কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া বাজিতে থাকে।
এ সকল…খেলিয়া—এই রাখাল-বালকদের কত পুণ্য ছিল, তাই তাঁহার সখা হইতে পারিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইতেছে।
শ্রীরঘুনন্দন…ভাবিয়া—পদকর্তা রঘুনন্দন করযোড়ে নিবেদন করিতেছেন, কোন্ ভাগ্যে বৃন্দাবনের এই গৌরব, সেই গূঢ় তথ্য ভাবিয়া পাওয়া যায় না।
২০। পরতীত—প্রতীতি, বিশ্বাস।

গুরুজন-আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে জলেকে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিনু সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে ॥

২১

আধক আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
তুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥

যমুনার জল…পরাণ রয়—যমুনার কাল জল চোখের সামনে ঝলমল করিতে থাকে। তাহা দেখিয়া মনকে ধরিয়া রাখি কেমন করিয়া? যমুনার সেই উচ্ছল কাল জল যে শ্রীকৃষ্ণের ঝলমলে কালরূপের কথা মনে করাইয়া দেয়।

২১। যব ধরি—যখন হইতে। দিঠি অঞ্চল—নয়ন-প্রান্ত।

আধক আধ……পরাণ—অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক নয়ন-প্রান্ত দিয়া অর্থাৎ ঈষৎ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে যখন হইতে দেখিয়াছি, তখন হইতে শতকোটি মদন-বাণে আমি জর্জরিত হইতেছি। প্রাণ আছে কি গেছে বুঝিতে পারিতেছি না।

বিহি—বিধি। বাম—বিমুখ।

তুহুঁ…পরণাম—(ঈষৎ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে যে হরিকে দেখিয়া আমার এই অবস্থা) সেই হরিকে যে নারী দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারে, তাহার চরণে প্রণাম জানাই, অর্থাৎ তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করি।

সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জলু আগি ॥
প্রেমবতী প্রেম- লাগি জিউ তেজত
চপল জীবন মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী-রস-মরিযাদ ॥

২২

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

সুনয়নী—যে নারী সুনয়নের অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির বড়াই করে (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত)। আগি—অগ্নি।

সুনয়নী…আগি—শ্রীরাধা বলিতেছেন, সুনয়নীরা বলে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ সজল মেঘের শ্যামল রূপের মতই স্নিগ্ধ এবং নয়নাভিরাম; আমার নিকট কিন্তু সে রূপ বিদ্যুতের মত জ্বালাদায়ক। সে রূপ বিদ্যুতের মত দৃষ্টিকে ধাঁধাইয়া দেয় এবং অন্তরকে দগ্ধ করে। অন্যান্য রসিকারা শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ লাভ করিয়া রস-সাগরে ভাসিতে থাকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ তাহাদের নিকট সুখদায়ক। আমার নিকট কিন্তু সে রূপ তাপদায়ক। সে রূপ আমার অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ যতই দেখি, রূপতৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যায়; যতই তাঁহার স্পর্শ লাভ করি, নিবিড়তর স্পর্শলাভের বাসনা মনকে ততই অস্থির করিয়া তুলে।

প্রেমবতী…সাধ—অন্যান্য প্রেমিকারা প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করে; আমার কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী চপল জীবন ধারণ করিতে সাধ যায়। জীবন যে চপল অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী শ্রীরাধা তাহা ভাল করিয়াই জানেন। জীবন চিরস্থায়ী হইলে তিনি কৃষ্ণপ্রেম অনন্তকাল ধরিয়া আস্বাদন করিতে পারিতেন। সে উপায় যখন নাই, তখন এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের কটা দিনই বা তিনি কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদনের সুখ হইতে বঞ্চিত হন কেন?

রস মরিযাদ—রসের বা প্রেমের মর্য্যাদা।

২২। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অনুভব মোয়—আমার ভাব (অনুভাব—অনুভূতি) সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সোই…হোয়—ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কারণ, ইহা অসাড় জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না। প্রেম কখনও পুরাতন হয় না, ইহা তিলে তিলে, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হয়। যাহা ক্ষণে ক্ষণে নূতন হয়, তাহাকে কি বলিয়া বর্ণনা করিব?

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

নেহারলুঁ—দেখিলাম। তিরপিত—তৃপ্ত।
শ্রুতিপথে…গেল—শ্রুতিপথে গিয়াও যেন স্পর্শ করিল না, অর্থাৎ শুনিয়াও যেন শুনিলাম না—আবার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।
মধু-যামিনী—বসন্তকালের রাত্রি। রভসে—ক্রীড়াকৌতুকে।
না বুঝলুঁ…কেল—কিরূপভাবে কাটাইলাম তাহা বুঝিলাম না। হিয়ে হিয়ে—বক্ষে বক্ষে।
তব…গেল—তবু বক্ষ জুড়াইল না, আরও সাধ হয়। বিদগধ—বিদগ্ধ, রসজ্ঞ।
কত…পেখ—কত রসজ্ঞ ব্যক্তিই দেখিলাম, কিন্তু কাহারও মধ্যেও প্রকৃত অনুভব দেখিলাম না; অর্থাৎ কেহ যে বুঝিয়াছে, এমন দেখিলাম না। পেখ—দেখিলাম।
কহ কবিবল্লভ—'বিদ্যাপতি কহ'—পাঠান্তর। পদটি এত সুন্দর যে, অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মনে করেন।

ষষ্ঠ স্তবক

রূপোল্লাস

১

এমন কালিয়া-চাঁদের কে বনালা বেশ।
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক রৈল শেষ॥
গগনেতে এক চাঁদ তাই সে মোরা জানি।
তরু-মূলে চাঁদের গাছ কে রুপিল আনি॥
দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রন্ধে।
আর দশ চাঁদ রাঙ্গা চরণারবিন্দে॥
মকর-কুণ্ডল কানে চাঁদে ঝলমল।
গলায়ে মালতী-মালা চাঁদে দিছে কোল॥
কপালে চন্দন-চাঁদ করিয়াছে আলা।
চূড়াতে ময়ূর-পুচ্ছে চাঁদে করে খেলা॥
বংশীবদনে বোলে চাঁদ-মাঝে চাঁদ।
দেখিলে এড়ান নাহি প্রেম-রস-ফাঁদ॥

২

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি-কুল-শীল-লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে॥

১। বনালা—বানাইল। রুপিল—রোপণ করিল। রন্ধে—রন্ধ্রে, ছিদ্রে।
দশ চাঁদ..রন্ধে—মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণের দশটি অঙ্গুলি খেলিতেছে; সেই দশটি অঙ্গুলির দশটি নখকে এখানে দশটি চন্দ্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।
আর দশ...চরণারবিন্দে—শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দশটি নখ আর দশটি চন্দ্র।
এড়ান নাহি—ছাড়ান্ নাই; মুক্তি নাই।
২। কানড়—নীলোৎপল।

সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে না চাইহ তাহার পানে
কালিয়া-বরণ যার দেখ ॥
আরতি পিরীতি মনে যে করে কালিয়া-সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া-ভূষণ কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

৩

দেইখ্যা আইলাম তারে—
সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব-গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া-বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা ॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥
গৃহকর্ম্ম করিতে আলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ ॥

আরতি—অনুরাগ, প্রেম। উচাটন—অস্থির পাকে—পরিণামে।
৩। এক অঙ্গে...ধরে—একই দেহে একসঙ্গে এত রূপ দেখিবার পক্ষে দুটি মাত্র চক্ষু যথেষ্ট নয়। —এক দিক্ দেখিতে আর এক দিক্ বাদ পড়িয়া যায়।
কদম্ব-হিলন—কদম্ববৃক্ষে হেলিয়া দণ্ডায়মান। আলায়—এলাইয়া পড়ে।

৪

দরশনে উনমুখী দরশন-সুখে-সুখী
আঁখি মোর নাহি জানে আন।
যাঁহা যাঁহা পড়ে দিঠি তাঁহা অনিমিখে ছুটি
সে রূপ-মাধুরী করে পান ॥
মধুর হৈতে সুমধুর মধুর অমিয়া-পুর
মধুর মধুর মৃদু হাস।
চঞ্চল কুণ্ডল-আভা ঝলমল মুখ-শোভা
দেখিতে লোচন-অভিলাষ ॥
কহিতে রূপের কথা মরমে পরম ব্যথা
লাখে বিধি না দিল বয়ান।
দেখে আঁখি কহে মুখ তাতে কি পূরয়ে সুখ
তাহে বড় রসের পরাণ ॥
দেখে আন কহে আন অনুভব অনুমান
তাহে কি পরাণ পরবোধ।
কহিতে না পারি দেখি অতয়েব ঝরে আঁখি
শ্যামদাসের মরম-বিরোধ ॥

৫

হেন রূপ কবহুঁ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লৈতে নারি আঁখি ॥

৪। উনমুখী—উন্মুখী, উৎসুকা। আন—অন্য।
দিঠি—দৃষ্টি, নয়ন। অনিমিখে—অনিমেষে।
কহিতে···বয়ান—রূপের কথা বলিতে গিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া ব্যথা পাই যে, বিধাতা আমাকে লক্ষ মুখ দিলেন না কেন।
দেখে আঁখি···পরবোধ—রূপ যে দেখে (চোখ) সে বর্ণনা করে না, বর্ণনা করে অন্যে (মুখ)। সুতরাং সে বর্ণনা প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল না হইয়া অনুমানের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। রসিক-চিত্ত ইহাতে প্রবোধ লাভ করিবে কিরূপে?
৫। কবহুঁ—কখনও।

অঙ্গে নানা অভরণ　　কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে　　ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
বিনা মেঘে ঘন-আভা　　পীত-বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া　　দো-সূতী মুকুতা বেড়া
মত্ত ময়ূর-পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্ব-মালা　　জিনিয়া মদন-কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পুরে　　অবলা পরাণে মরে
বলিহারি যায় বংশীদাস॥

অভরণ—আভরণ, অলঙ্কার।　　বাসি—মনে করি।

অঙ্গে…বাসি—শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য-চঞ্চল কাল অঙ্গে নানা রত্নালঙ্কার ঝিকমিক করিতেছে; মনে হইল যেন কালিন্দীর (কাল জলে) তরঙ্গে তরঙ্গে চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসিয়া চলিয়াছে।

মিশামিশি হৈল রূপে—উপমান উপমেয়ের সৌন্দর্য্য মিশিয়া এক হইয়া গেল; আভরণ-আভা ও চন্দ্রচ্ছবি যেন শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যতরঙ্গোচ্ছল দেহে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

মত্ত ময়ূর-পুচ্ছ—ময়ূরের আবেগ-মত্ততা যেন বায়ুভরে ঈষৎ দোদুল্যমান শিখিপুচ্ছে সঞ্চারিত হইয়াছে।

গলায়…মদন-কলা—কদম্বমালার সহজ সজ্জা যেন প্রণয়কলার সমস্ত প্রসাধন-চাতুরীকে ধিক্কার দিয়াছে।

সপ্তম স্তবক

অভিসার

১

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

১। কণ্টক গাড়ি···ঝাঁপি—কণ্টক পুঁতিয়া (গাড়ি), কমলের ন্যায় কোমল পদের নূপুর বস্ত্র (চীর) দ্বারা আবৃত করিয়া, পাছে নূপুরের শব্দ হয়, এই আশঙ্কায়। যখন বঁধুর বাঁশী বাজিবে তখন হয়ত কণ্টকময় পথে চলিতে হইবে, এইজন্য আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া কণ্টকময় পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।

গাগরি···চাপি—কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া মাটিতে পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। পথে পা হড়কাইয়া না যায় এইজন্য অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে বঁধুর লাগিয়া অভিসারে যাইতে হইবে, সেইজন্য পিছল পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই পদ ভাঙ্গিয়া লিখিয়াছেন :

"অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়া অতি পিছল,
গড়াগড়ি করিয়া শিখিতাম—
আমার চলতে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে।"

মাধব···জাগি—হে মাধব, তোমার লাগিয়া অতি দুস্তর (দূতর) পথে কিরূপে অভিসার করিতে হইবে, নিজ গৃহে রাত্রি জাগিয়া রাধা সেই সাধনা করিতেছেন।

কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

২

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার॥

কর-যুগে—হস্তদ্বয় দ্বারা। নয়ন মুদি—চক্ষু মুদিত করিয়া। চলু ভামিনী—রমণী (রাধা) চলেন।
তিমির···আশে—অন্ধকারে ভ্রমণ করা শিখিবার আশায়। আঁধার রাতে বঁধুর নিকটে যাইতে হইবে বলিয়া অভ্যাস করিতেছেন।
কর-কঙ্কণ-পণ—হস্তের কঙ্কণ পণ (পুরস্কার দেওয়া স্বীকার) করিয়া।
ফণিমুখ-বন্ধন—সর্পের মুখ কিরূপে বন্ধ করিতে হয় (অর্থাৎ যাহাতে সাপ কামড়াইতে না পারে)।
শিখই···পাশে—ভুজগ-গুরু অর্থাৎ সাপের গুনার নিকট শিক্ষা করিতেছেন। আঁধার রাতে বঁধুর উদ্দেশে পথ চলিতে সাপ সম্মুখে পড়িলেও ক্ষতি না হয়, এইজন্য।
গুরুজন···আন—গুরুজনের উক্তি শুনিয়াও শোনে না—বধিরের ন্যায় এক কথা শোনেন অন্যরূপ উত্তর দেন।
মুগধী—নির্বোধ।
পরিজন···পরমাণ—পরিজনের বাক্য শুনিয়া মুগ্ধার (বিহ্বলার) মত হাসিতে থাকেন।
পরমাণ—সাক্ষী।
২। মন্দির···কপাট—গৃহের বাহিরে কঠিন দরজা—ইহা প্রথম বাধা।
চলইতে···বাট—দ্বিতীয় বাধা—চলিবার সময়ে পথ (বাট) পঙ্কিল বা কর্দমময় এবং শঙ্কাপূর্ণ বা বিপজ্জনক (শঙ্কিল)।
তহি—তাহার উপর। দূরতর—দূরব্যাপী।
বাদল দোল—বর্ষা দোল খাইতেছে, বৃষ্টি ঝাঁপিয়া আসিতেছে।
বারি···নিচোল—বারি কি নীল অঞ্চলে বারণ করিতে পারে—তোমার নীল শাড়ী কি এই বর্ষার জলধার ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? কৈছে—কিরূপে।
হরি···পার—হরি মানসগঙ্গার (বৃন্দাবনে মানসগঙ্গা নামে এক হ্রদ আছে) অপর পারে আছেন।

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

৩

কুল মরিযাদ- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি॥

শুনইতে…যাত—শুনিলে মর্ম্ম জ্বলিয়া যায়। দহন—জ্বালা। বিথার—বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া।
উচকই—চমকিত হইয়া উঠে। লোচন-তার—চক্ষুর তারা। ইথে—ইহাতে।
উপেখবি—উপেক্ষা করিবি, অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করিবে।
ইথে…বিচার—এখন আর কি বিচার চলে?
ছুটল বাণ…নিবার—যে বাণ ছুটিয়াছে তাহাকে কি যত্ন করিলে নিবারণ করা যায়?
ছুটল—ছোড়া, যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (বিশেষণ)।
৩। মরিযাদ—মর্যাদা। কুলমর্য্যাদারূপ কঠিন কপাট উদ্‌ঘাটন করিলাম, কাঠের কপাট আমার অভিসারে বাধা দিবে?
নিজ…সিন্ধু—আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র। পঙারলুঁ—(গোষ্পদের ন্যায়) পার হইলাম—বৃন্দাবনে প্রচলিত।
তটিনী অগাধা—সখীরা মানসগঙ্গার কথা বলিয়াছেন, শ্রীমতী এখানে তাহার উত্তরে বলিতেছেন।
পরিখন…দূর—আর আমাকে পরীক্ষা করিও না।
কৈছে…ঝুর—হরি আমার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহাই স্মরণ করিয়া আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে।
কোটি…লাগি—মদনের শরে যে অহর্নিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, বাদলধারায় তাহার কি করিবে?
সহ—সহিতেছে।
বজরকি আগি—বজ্রের অগ্নি।

যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপল
তাহে তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥

৪

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি, আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত নতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর- বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥

যছু…অনুরোধ—আমার জীবনই তাঁহার পদতলে সমর্পণ করিয়াছি, এখন কি দেহের মায়া করিব? "প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ"—এই কথার উত্তর।

৪। মেহ—মেঘ। কুলিশ-পাতন—বজ্রপাত।

বলগই—আস্ফালন করিতেছে, অর্থাৎ শোঁ শোঁ শব্দে মাতামাতি করিতেছে।

আগুসরি—অগ্রসর হইয়া।

এ মঝু…ঝাঁপ—গুরুজনদের নিষ্ঠুর (সতর্ক) দৃষ্টি এখন দুর্যোগের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন।

তুরিতে…আগুসার—সখি, বসিয়া বসিয়া কি বিচার করিতেছ? (অর্থাৎ এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া অভিসারে বাহির হওয়া উচিত কি-না, সে বিচার এখন ছাড়িয়া দাও।) আমার জীবনের জীবন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত-কুঞ্জে আগেই চলিয়া গিয়াছেন। অথবা আমার মন-প্রাণ আগেই সঙ্কেত-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেহটাই কেবল এখানে পড়িয়া রহিয়াছে।

রায় শেখর…বিথার—পদকর্তা বলিতেছেন, শ্রীরাধা, আমার কথায় তুমি অভিসারে বাহির হইয়া পড়। এই (বিস্তৃত) বিথার বিঘ্নরাশি কি আর এমন একটা সাংঘাতিক বাধা।

৫

কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই ন পারই গেহ।
গুরু-দুরুজন-ভয় কিছু নাহি মানয়
চীর নহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ অনুরাগরীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগভয় শতশত
তবু নহি মানয়ে ভীত॥
সখীগণ তেজি চললি একেশ্বরী
হেরী সহচরীগণ ধায়।
অদ্ভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তেজি সঙ্গ নহি পায়॥
চললি কলাবতী অতিশয় রসভরে
পন্থ-বিপথ নহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ
মনহি উজোরল কান॥

৬

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥

৫। দেখ দেখ..ভীত—প্রেমের কি বিচিত্র রীতি দেখ। ঘন-অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্যোগময়ী রজনী, পথে শত শত সর্পের ভয়, তথাপি মনে এতটুকু ভয় নাই।

সখীগণ তেজি..নহি পায়—সখীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা একাই পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। অগত্যা সখীগণকেও যাইতে হইল। তাহারা এই দুর্যোগময়ী রজনীতে পথে বাহির হইতে সাহস করিতেছিল না; রাইকে যাইতে দেখিয়া তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল,—একাকিনী তাহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দেয়? শ্রীরাধাকে তাহারা অনুসরণ করিল বটে, কিন্তু অদ্ভুত প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গিতচিত্ত শ্রীরাধা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ বিপথ না মানিয়া দ্রুত ছুটিয়াছেন, তাই সখীরা তাঁহার নাগাল পাইল না।

জ্ঞানদাস..কান—পদকর্তা বলিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে যাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পক্ষে সবই সম্ভব।

৬। মেঘ-যামিনী—মেঘাবৃত রাত্রি। আন্ধিয়ার—অন্ধকার। ঐছে—এমন। করু—করে। আপি—ব্যাপিয়া। ঝাঁপি—আবৃত করিয়া।

দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝর ঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত-গেহ ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগররাজ ॥

৭

অজি অদভুত তিমির-রঙ্গ
আপনি না চিহ্নে আপন অঙ্গ
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ
অঙ্কুশ নাহি মান রে ॥
সাজলি ধনি শ্যাম-বিহার
শিথিলীকৃত কবরী-ভার
নীলোৎপল-রচিত হার
কণ্ঠহি অনুপাম রে ॥
নীল বসন দোঁহার গায়
কি মেঘে বিজুরী লুকিয়া যায়
মদন-দীপ পথ দেখায়
অনুরাগ আগুয়ান রে ॥
পরিমল পাই ভ্রমর-পুঞ্জ
বৈঠল আসি চরণ-কুঞ্জ
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ
লাগল মধুপাম রে ॥

বরিখত—বর্ষণ করে। মেহ—মেঘ। নাহ—নাথ (কৃষ্ণকে)। যাঁহা—যেখানে।

৭। না চিহ্নে—চিনিতে পারে না। অঙ্কুশ—লৌহনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র হস্তি-তাড়ন-দণ্ড, ডাঙ্গশ। অঙ্কুশ নাহি মান রে—শ্রীরাধার মন-রূপ মত্ত-মাতঙ্গ আজ কোন কিছুর শাসন মানিতেছে না।

নীল বসন. .আগুয়ান রে—গগন এবং শ্রীরাধা দুজনেরই সর্বাঙ্গ আজ নীল বসনে আবৃত। শ্রীরাধার সর্বাঙ্গ যেমন নীল বসনে ঢাকা, সারাটা আকাশও সেইরূপ ঘন-নীল মেঘে সমাচ্ছন্ন। বিদ্যুদগর্ভ মেঘের মত শ্রীরাধা তাঁর অপূর্ব অঙ্গজ্যোতি নীল বসনের আড়ালে লুকাইয়া লইয়া অভিসারে চলিয়াছেন। ওদিকে আকাশও এমন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন যে, বিদ্যুদ্দীপ্তি তাহাতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে অর্থাৎ বিদ্যুতের চকিত আলোকেও যে কোন প্রকারে পথ চিনিয়া লইবেন, সে উপায় নাই। এহেন নীরন্ধ্র অন্ধকারে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ দীপবর্তিকাই শ্রীরাধাকে পথ দেখাইয়া চলিল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার যে গভীর অনুরাগ, সেই অনুরাগই শ্রীরাধাকে সঙ্কেত-কুঞ্জের পানে আগাইয়া দিল।

মুখ-মণ্ডল শশী উজোর
হেরি ধায়ল তহিঁ চকোর
উড়িয়া পড়ে হই বিভোর
চাহে পীযূষ দান রে।
পথে পরমাদ হেরিয়া রাই
নীল-বসনে মুখ ছিপাই
সঙ্কেত-কুঞ্জে মিলল আই
যাঁহা নিবসই কানু রে।
রাই-আগমন নিরখি কান
শীতল ভেল তপত প্রাণ
নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান
আদরে আগুসার রে।
আইস আইস ধরহ হাত
লহ লহ নাথ পুছত বাত
শশী কহে শুন পরাণনাথ
আজু বড় আন্ধিয়ারি রে।

৮

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি।
পিরীতি-মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা।

মুখ-মণ্ডল..দান রে—এই সময়ে অসাবধানতাবশতঃ মুখাবরণখানি কখন খসিয়া পড়িয়াছে, শ্রীরাধা তাহা টের পান নাই, ফলে, চন্দ্রের মত উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি প্রকাশিত হইল। তাহা দেখিয়া চকোর চন্দ্র-ভ্রমে সেই দিকে ধাবিত হইল।

পথে…ছিপাই—চকোরকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চন্দ্রবদনখানি কখন অলক্ষিতে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তখন পথের বিপদের কথা শ্রীরাধার মনে পড়িয়া গেল অর্থাৎ তাঁহার ভয় হইল এখনি কেহ তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিবে।

৮। আগুসরি—অগ্রসর হইয়া আসিয়া।

হেরইতে…আঁখি—সুন্দর পদযুগল মুছাইতে গিয়া অনিমিখে সেই চরণ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

পিরীতি…সেবা—প্রেমের যিনি মূর্তিমতী দেবতা এবং যাঁহার দর্শনে সকল দুঃখ দূর হইল, তিনি নিজে চরণ সেবা করিতেছেন।

হিমকর-শীতল নীরহি তিতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি অধরে তাম্বূল পুরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া-সিনান॥

৯

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥

হিমকর…মুখ—চন্দ্রের কিরণে যে জল শীতল হইয়াছে, তাহাতে আর্দ্র (তিতল) করতল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতেছেন।

বীজই—ব্যজন করিতেছেন।

পুছই…দুখ—পথের ক্লেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

গোবিন্দদাস…সিনান—পদকর্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম-সুধাধারায় নিত্য নূতন করিয়া স্নান হইতেছে।

৯। দৈব-বিপাক—দৈব-দুর্দ্দশা।

পথ…লাখ—যদি লক্ষ মুখ পাই তবুও পথ-গমনের সমস্ত কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না।

মন্দির…আওলুঁ—গৃহত্যাগ করিয়া যখন দুই চারি পদ অগ্রসর হইলাম।

নিশি..অঙ্গ—অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

পথ..পারিয়ে—পথ দেখিতে পাইলাম না। বেঢ়ল—বেড়িল।

কুহু যামিনী—অমাবস্যা রাত্রি। বরিখয়ে—বর্ষণ করে।

হাম…কোন পুর—আমি কোন স্থানে যাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।

একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চিরদুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

১০

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥

একে পদ-পঙ্কজ···জর জর ভেল—একে আমার পদ কর্দমাপ্লুত, তাহাতে আবার তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইল। "পঙ্কজ" স্থলে "কম্পিত" পাঠ হইলেই অধিক সঙ্গত হয়। নিজের মুখে পদ-পঙ্কজ বলা শোভন হয় না।

জর জর—জর্জরিত। কছু নাহি জানলুঁ—কিছুই জানিতে পারিলাম না।
অব—এখন। প্রবেশল—প্রবেশ করিল। ছোড়লুঁ—ছাড়িলাম।
পন্থক..গণলুঁ—পথের কষ্টও তৃণবৎ গণ্য করিলাম না। কহতহি—কহিতেছেন।

১০। এটি এবং পরের দুইটি পদ রসোদ্গারের। রসোদ্গার অর্থে (সখীদের নিকট) স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করা। বাটে—বর্ত্মে, পথে।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় এই পদটির খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই পদের ইঙ্গিত এইরূপ—ভগবান্ আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না। পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী॥

সঙ্কেত করিয়া—একবার সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়াছিলাম।
আনল—অনল, অগ্নি। ভেজাই—লাগাইয়া দিই।

অষ্টম স্তবক

মান ও কলহান্তরিতা

১

ধনি ভেলি মানিনী সখীগণ মাঝ।
অনুনয় করইতে উপজায় লাজ॥
পিরীতিক আরতি বিরতি না সহই।
ইঙ্গিত-ভঙ্গিয়ে দুহুঁ সব কহই॥
রাই সুচেতনী কানু সিয়ান।
মনহি সমাধল মন-অভিমান॥
হরি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়।
সম্রমে বৈঠলি ধনি কর লায়॥
নিজ নূপুর ধর ধরু বনমালী।
সখী-সঙ্গে অনত চলত বর নারী॥

১। ভেলি—হইল।
ধনি…মাঝ—শ্রীরাধা সখীদের সাক্ষাতেই মান করিয়া বসিলেন।
অনুনয়…লাজ—(সকলের সাক্ষাতে) অনুনয় করিতে লজ্জায় বাধিল।
বিরতি না সহই—বিলম্ব সহে না।
ইঙ্গিত-ভঙ্গিয়ে…কহই—ইঙ্গিতের ভঙ্গিতে, অর্থাৎ ইসারায় দুজনে সব কথা কহিলেন।
হরি…ধনি-পায়—কৃষ্ণ তাঁহার মস্তকের ছায়া শ্রীমতীর পায়ের উপর ফেলিলেন, অর্থাৎ চরণে মাথা ঠেকাইবার উদ্দেশ্যে মস্তক নত করায় কৃষ্ণের মস্তকের ছায়া শ্রীমতীর পায়ের উপর গিয়া পড়িল।
ধনি…লায়—অমনি শ্রীমতী (কৃষ্ণের উদ্দেশ্য) বুঝিতে পারিয়া কর দ্বারা নিজ পদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ হাত দিয়া পা ঢাকিলেন।
নিজ নূপুর…বনমালী—(তখন) চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার ছলে কৃষ্ণ নিজের নূপুর স্পর্শ করিলেন।
সখী-সঙ্গে…বর নারী—(অমনি) শ্রীরাধা উঠিয়া সখীগণের সঙ্গে অন্যত্র (অনত) চলিলেন।

অধরে মুরলী যব ধরু বনমালী।
ফোই কবরী ধনি বান্ধি সঞারি ॥
কহ কবিশেখর বুঝয়ে সিয়ান।
ইঙ্গিতে রস বরখল পাঁচবাণ ॥

২

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাসে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥
রাই কত পরখসি মোরে আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

সঞারি—সংস্কার করিয়া।

অধরে…সঞারি—(কোনও রূপে মান ভাঙিল না দেখিয়া) কৃষ্ণ তাঁহার বাঁশীটি (বাজাইবেন বলিয়া) যেমন অধরে ধরিয়াছেন, (অমনি) রাধা কবরী খুলিয়া আবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ সন্ধ্যাসমাগমে মিলন হইবে, নিজ ঘন তিমিরবর্ণ কেশরাশি দেখাইয়া ইঙ্গিত দিলেন।

২। রাধিকার মানের পরে কৃষ্ণের অনুনয়।

নয়ান-নাচনে…পুতলী—তোমার চোখের নাচনে আমার হৃদয় নাচিয়া ওঠে।

হিয়ার পুতলী—হৃদয়, চিত্ত-পুত্তলিকা। পীত পিন্ধন—পীতবর্ণ বস্ত্র। তুয়া—তোমার।

তুয়া অভিলাসে—তুমি গৌরী, এইজন্য আমি পীতবর্ণের বসন পরিয়া থাকি, তোমার কথা মনে পড়িবে বলিয়া।

পরাণ…নিঃশ্বাসে—তুমি যদি একটিবার নিঃশ্বাস ফেল, তবে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে (তোমার কষ্টের আশঙ্কায়)।

পরখসি—কত আর আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে?

তুয়া…সংসার—আমি যে তোমাকে আরাধনা করি তাহা সমস্ত সংসারের লোক জানে।

লেহ লেহ…মুরলী—আমার এই হাতের বাঁশীটি একবার ধর, আমি উভয় হস্তে তোমার চরণ ধারণ করিব।

লেহ—লও। ভোর—বিভোর।

তুয়া…চোর—তোমার চোখের অঞ্জনে পরের চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ।

আগুলি—অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ। বিহি—বিধি।

এত ধনে…কৃপণ—যে এত ধনী সে কেন আমাকে প্রেম দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করে।

৩

মাধব, কাহে কান্দাওসি হামে।
চল চল সো ধনি-ঠামে॥
তুঁহারি হৃদয়-অধিদেবী।
তাক চরণ যাউ সেবি॥
যো যাবক তুয় অঙ্গ।
ততহি করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পুরব তুয় কাম।
কি ফল মুগুধিনী-ঠাম॥
এত কহ গদগদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥

৪

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গরয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
চরণযুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই ন পার॥
মানিনী ন হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠই নাগর কান॥
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানু-মুখ চাই॥

৩। মাধব…সেবি—মানিনী শ্রীরাধা এখানে অভিমান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—অন্য নারীর সহিত রাত্রিযাপন করিয়া এখন মানভঞ্জনের ছলে প্রেমের কপট অভিনয় করিয়া আমাকে বৃথা কাঁদাইতে আসিয়াছ কেন? যে নারী তোমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (আমার চরণ ছাড়িয়া) তাহার চরণ-সেবা করিতে যাও।

যো যাবক…রঙ্গ—যে রমণীর চরণের অলক্তক-রাগচিহ্ন তোমার অঙ্গে শোভা পাইতেছে (আমাকে পরিত্যাগ করিয়া) সেই রমণী যেখানে রহিয়াছে, তথায় গিয়া পুনর্বার প্রেমলীলা কর।

মুগুধিনী—মুগ্ধা, সরলা।

সোই পুরব…মুগুধিনী ঠাম—শ্রীরাধা বলিতেছেন—আমার মত সরলা নারীর নিকট আসিয়া কি ফল হইবে? তোমার মত কুটিল ব্যক্তির সহিত কুটিল নারীরই ঠিক মিল হইবে।

৪। পরসাদ—প্রসাদ, অনুগ্রহ। গরয়ে—গলয়ে, গলিয়া পড়ে, গড়াইয়া পড়ে।
লোর—অশ্রু। পসারল—প্রসারিত করিল। পরিহার—মিনতি।
নাহ—নাথ জনি—যেন না।

৫

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মা গো, কিয়ে ইহ জীদ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পাওরী উতারব পার ॥
শ্যামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ
ঝর ঝর নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির ॥
সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহা বিকল
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।
মনমথ দাহ- দহনে মন ধসি গেও
রোখে চলল নিজ বাস ॥
অবিরোধি প্রেম- পন্থ তুহু রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি ওরে নাহি চাহ ॥

৫। কৈছে…রঙ্গে—ইহা সখীর উক্তি। সখী বলিতেছে—মানভঙ্গ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তোর পায়ে ধরিতে আসিলে তুই কেমন করিয়া (কোন্ প্রাণে) তার সেই কর-পল্লব পায়ে করিয়া ঠেলিয়া দিলি? তুই অভিমান-রূপ কালসাপের সহিত মিতালী করিয়াছিস্ অর্থাৎ অভিমান-রূপ কালসর্পের পাল্লায় পড়িয়া হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিস্। এই কালসর্প দংশনের পর দংশন করিয়া তোর জীবন যখন নৈরাশ্যের বিষে জর্জরিত করিবে, তখন মজাটা দেখিবি।

কো অছু…পার—কে এমন ধীরমতি মহাবল বীর আছে, যে তোর মত পামরীকে (পাওরি) এই বিপদ্-সমুদ্র পার করিয়া দিবে? অর্থাৎ তোর মত পামরীকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করা অতি বড় শক্তিশালী ব্যক্তিরও অসাধ্য।

পীতাম্বর…থির—গললগ্নীকৃতবাসে তোর পায়ে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গলার পীতবাসখানি তোর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। ইহার পরও তুই কেমন করিয়া বুক বাঁধিয়া রহিলি?

ছরমি—শ্রমযুক্ত। ঘরমি—ঘর্ম্মযুক্ত।

অবিরোধি…নাহ—যে প্রেমপ্রবাহ স্বচ্ছন্দ স্বভাব গতিতে বহিতেছিল, তাহার সেই অবিচ্ছিন্ন একমুখী গতি তুই রুদ্ধ করিলি।—ইহাতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের লেশমাত্র দোষ দেখিতেছি না।

হামারি ওরে—আমার দিকে; আমার পানে।

বৃন্দাবন কহ…চাহ—পদকর্তা বৃন্দাবনদাস সখীভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, আমার নিষেধ যখন মানিলে না, তখন আমার মুখের পানে চাহিও না, অর্থাৎ আমার ভরসা ত্যাগ কর, অর্থাৎ মিলন ঘটাইবার জন্য আমি যে দূতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইব, সে আশা করিও না।

৬

আকুল প্রেম পতিল নহি জানলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥
সজনি, তোহে কহু মরমক দাহ।
কানুক দোষে যো ধনি রোখয়ে
সোই তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরয লাজ মান সঞে ভাঙ্গল
জীবন বহুত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
কানুক-ঐছন নেহ॥

৬। আকুল...পরাণ—শ্রীরাধা বলিতেছেন—স্বার্থপূর্ণ সঙ্কীর্ণ প্রেমে অন্ধ হইয়া পূর্ব্বে আমি শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব-সম্বন্ধে সচেতন হই নাই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু আমার নন, বিশ্ববাসী সকলেরই যে তিনি হৃদয়বল্লভ, পূর্ব্বে সে কথা বুঝিতে না পারিয়া আমি আদর পাইবার অভিলাষে (অর্থাৎ আমিই একা তাঁহার আদরিণী হইব এই অভিলাষ করিয়া) তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া দিবারাত্র প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি।

ধৈরয...সন্দেহ—মানভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য এবং লজ্জার বাঁধও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানাবস্থা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কৃষ্ণ-বিরহ ধৈর্য্য ধরিয়া সহিয়াছিলাম এবং মিলিত হইবার প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও লজ্জায় নিজেকে সংযত করিয়াছিলাম; এখন মানাবসানে সে ধৈর্য্য এবং লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। এ অবস্থায় যে অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

কানুক ঐছন নেহ—পদকর্ত্তা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ঐরূপই, অর্থাৎ তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র সত্যই সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ তিনি সকল জীবেরই হৃদয়বল্লভ।

৭

শুনইতে কানু- মুরলীরব-মাধুরী
　　শ্রবণ নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলু
　　তব মোহে রোখলি ভোর॥
　　সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে প্রেম বাঢ়ায়বি
　　জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
　　কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ-লাবণি
　　জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
　　শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্চহ
　　কহতহি গোবিন্দদাসে॥

৮

কুলবতী কোই জনি হেরই
　　হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াওই
　　প্রেমে করয়ে জনি মান॥

৭। শ্রবণ…তোর—কানে হাত চাপা দিয়াছিলাম, পাছে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়া তোকে পাগল করিয়া তোলে।

হেরইতে…ভোর—তোর চোখদুটি হাত দিয়া ঢাকিয়াছিলাম, পাছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আপন-হারা হইয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিস্‌ তুই তখন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আমার উপর রাগ করিয়াছিলি।

সুন্দরি…তোয়—আমি তখনই বলিয়াছিলাম, ভুল করিয়া অর্থাৎ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার সহিত যদি প্রেম করিস, তাহা হইলে তোকে সারাটা জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে।

বিনু গুণ পরখি—গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়া। খোয়সি—খোয়াইতেছিস্‌।

যো তুহুঁ…গোবিন্দদাসে—পদকর্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে বলিতেছেন,—প্রবল বাতাস যেমন মেঘকে উড়াইয়া লইয়া যায়, তুই ঠিক তেমনি করিয়া তোর প্রচণ্ড মানের প্রবল বাতাসে শ্যাম জলধরকে দূরে সরাইয়া দিলি, এখন তোর প্রেমতরুটির উপর কে বারি সিঞ্চন করিবে বল্‌? এখন দিবারাত্র 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া নয়ন জলে অভিসিঞ্চিত করিয়া তোর সেই বড় সাধের প্রেমতরুটিকে কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখ্‌।

৮। কুলবতী…মান—কুলবতী হইয়া কেহ যেন (পরপুরুষের পানে) না চায়; আর যদিই বা চায় ত শ্রীকৃষ্ণের পানে যেন না তাকায়; আর শ্রীকৃষ্ণের পানে যদিই বা চায় ত (ভুলিয়াও) তাহার সহিত যেন প্রেম করিতে অগ্রসর না হয়। আর যদিই বা প্রেম করে, তবে সে প্রেমের মধ্যে যেন মানের স্পর্শ না থাকে।

সজনি, অতএ মানিয়ে নিজ দোখ।
মান দগধি জীউ অবহঁন নিকসই
কানু সঙ্গে কি করব রোখ॥
হো মঝু চরণ- পরশরস-লালসে
নাথ মিনতি মোহে কেল।
তাকর দরশন বিনু তনু জরজর
পরশ পরশ-সম ভেল॥
সহচরী মেলি নাথ সমুঝায়লি
সো নহিঁ শুনলহঁ হাম।
গোবিন্দদাস কহ সরস বচনামৃতে
অব বাহুড়াওব কান॥

৯

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান॥
অরুণ নয়ান ঝরয়ে লোর।
গদ গদ স্বরে বচন বোল॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয়॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল যহি আনন্দ-রঙ্গে॥
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল॥
চরণ-কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥

পরশ পরশ-সম ভেল—শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ এখন আমার নিকট স্পর্শমণির মতই দুর্লভ হইয়া উঠিল।

বাহুড়াওব—ফিরাইয়া আনিব।

৯। হেরি বিধুমুখী…মান—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে শ্রীরাধা আতুর হইয়া উঠিয়াছিলেন, বাহিরে কিন্তু সে ভাব এতটুকু প্রকাশ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করা ত দূরের কথা, বরং সম্পূর্ণ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসিলেন। আসল কথা, নারী হইয়া পুরুষের নিকট নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিতে শ্রীরাধার সম্ভ্রমে বাধিল। সুচতুরা সখী তখন শ্রীরাধার মতলব বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার পায়ে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিতে ইঙ্গিত করিল। শ্রীকৃষ্ণও সখীর ইঙ্গিতমত কাজ করিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধার পায়ে ধরিলেন। শ্রীরাধা ঠিক এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে মান পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বাহিরে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি স্বেচ্ছায় মান পরিত্যাগ করেন নাই, নিতান্ত সখীর অনুরোধে অনিচ্ছায় মান ত্যাগ করিলেন।

ধনি-মুখ-শশী হরি-চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর॥
হৃদয়-উপরে শুতল রাই।
প্রেমদাস তব জীবন পাই॥

১০

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই॥
অঙ্গক ধুলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহু সনে মান করলু বর মাধব
হাম অতি অলপ-পরাণ॥
রমণীক মাঝে কহই শ্যাম সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি
অবহু টুটায়ব কেহ॥
সব অপরাধ খেমহ বর মাধব
তুআ পায়ে সোপলু পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদগদ
হেরইতে রাই-বয়ান॥

১০। সুবাসিত……রাই—রাই তখন (তৈখনে) কলসী (ঝারি) ভরিয়া সুবাসিত বারি আনিলেন।
দুখানি……মোছাই—(শ্যামের) দুইখানি চরণ ধৌত করিয়া (পাখালিয়ে) সুন্দরী রাধা আপনার কেশগুচ্ছ দ্বারা (কেশেতে) মুছাইলেন (মোছাই)। অলপ-পরাণ—সঙ্কীর্ণ চিত্ত।
রমণীক……দেহ—সকল রমণীর (রমণীক) মধ্যে (মাঝে) লোকে আমাকে শ্যাম-সোহাগিনী বলে (কহই), তাহাতে গর্ব্বে (গরবে) আমার (মঝু) বুক ভরিয়া উঠে।
হামারি……কেহ—আমার গর্ব্ব (গরব) তুমিই (তুহুঁ) পূর্ব্বে (আগে) বাড়াইয়াছ (বাঢ়াঅলি), এখন (অবহুঁ) কে তাহা ভাঙ্গিতে পারে (টুটায়ব)? অর্থাৎ রাধা বলিতেছেন, হে মাধব, তুমিই আমার গর্ব্ব বাড়াইয়া দিয়াছ এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমার উপর অভিমান করিয়াছিলাম।
খেমহ—ক্ষমা কর। তুআ—তোমার। সোপলুঁ—সমর্পণ করিলাম।

১১

দুহু মুখ-দরশনে দুহু ভেল ভোর।
দুহুক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥
দুহু তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
মান-বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহু জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহু কেলি-বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহঁ নরোত্তম দাস॥

———

১১। আনন্দ-লোর—আনন্দাশ্রু। মান-বিরামে—মানের অবসানে। দূরহিঁ দূরে—দূর হইতেও দূরে। রাধাকৃষ্ণ-কেলিবিলাস দেখার পক্ষে নিজ অযোগ্যতার জন্য পদকর্তা দীনতা প্রকাশ করিতেছেন।

নবম স্তবক

বংশী-শিক্ষা ও নৃত্য

১

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত ॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব-ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥
ভাল হৈল আইলা রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব ॥

২

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তূরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধ আলাঞা কবরী ॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোনা-বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ কদম্ব-হিলনে থাক
তবে সে বিনোদ-বাঁশী বাজে ॥

২। গৌর অঙ্গে······কস্তূরী—শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে কৃষ্ণ বানাইতে চান। তাই রাধাকে সর্ব্বাঙ্গে কস্তূরী মাখিয়া গৌর বর্ণ কাল করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন।
আলাঞা কবরী—কবরী এলাইয়া, অর্থাৎ কবরী খুলিয়া।
কদম্ব-হিলনে—কদম্ববৃক্ষে হেলান দিয়া।

মুরলী অধরে লেহ এই রন্ধ্রে ফুক দেহ
অঙ্গুলি দোলায়্যা দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি ॥

৩

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দ-সুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী ॥
হলে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥

দোলায়্যা—দোলাইয়া, দোয়াইয়া, হেলাইয়া।

জ্ঞানদাস…তুমি—শ্রীকৃষ্ণ এখানে শ্রীরাধাকে কদম্ববৃক্ষে হেলান দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে অর্থাৎ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিকই উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার এই উপদেশ-বাক্য আদৌ অলৌকিক বা অর্থহীন নয়। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণেরই পরাশক্তি বা পরাপ্রকৃতি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ান অর্থাৎ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করা শ্রীরাধার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

৩। শ্রীরাধা বাঁশী শিখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, আমার ন্যায় বেশ-ভূষা পর, আমার ন্যায় ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াও, তাহা নহিলে আমার বাঁশী বাজিবে না। শ্রীমতী তখন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি নিজের শাড়ী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পীতধড়া ও চূড়া পরিলেন। সখীরা দূর-বনে ফুলচয়নে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে আসিতে শ্রীমতীর বাঁশী শুনিয়া বলিতেছেন—আজ কে বাঁশী বাজাইতেছেন? ইনি ত কখনও শ্যাম নহেন। ইহার গৌরবর্ণে বন আলো করিয়াছে।

নটবর…কথি—নর্তকশ্রেষ্ঠের (অর্থাৎ কৃষ্ণের) বেশ এ কোথায় পাইল?

ইহার…চিকণবরণী—কৃষ্ণবর্ণা এক সুন্দরী ইহার বামে রহিয়াছেন। ইনি কে?

ঠারাঠারি—ইঙ্গিতে কথাবার্তা।

কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোন দেশে॥

৪

চাঁদবদনী নাচত দেখি।
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর॥
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু-অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী॥

কুঞ্জে…কমলিনী—আমরা দেখিয়া গিয়াছি কুঞ্জে কৃষ্ণ এবং রাধা ছিলেন। তাঁহারা কোথায় গেলেন? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

হবে…চরিত—বোধ হয় ইহাদের এইরূপ বেশ-বিপর্য্যয় (চরিত) কখনও ঘটিবে; অর্থাৎ ভবিষ্যতে কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইবেন।

এ রূপ…দেশে—অনেকে ইহা গৌরাঙ্গ-অবতারের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে করেন। নবদ্বীপে গৌরবর্ণ নটবরবেশ পরে দেখা গিয়াছিল।

৪। এটি এবং ইহার পরের কবিতাটি নৃত্য-রাসের পদ।

না হবে…মঞ্জীর—দ্রুত নাচিতে হইবে, কিন্তু যেন অতিশয় গতিহেতু ভূষণের ধ্বনি না হয়, অঞ্চল যেন না উড়ে, এবং নূপুরের শব্দ যেন না হয়।

চীর—বস্ত্র। মঞ্জীর—নূপুর।

বিষম সঙ্কট—তালের নাম। গায়কেরা এই গান গাহিবার সময়ে তাহার বোল আবৃত্তি করিয়া থাকেন: তাতা থৈয়া থৈয়া তিনি থিটি তিনি থিটি থাঁ ইত্যাদি।

ধনু-অঙ্কের—ধনু-আকারে (অনেকটা ধ-এর মত) অঙ্কপাত (রেখাপাত) করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিব, তাহারই মধ্যে নাচিতে হইবে।

এই সকল বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু এখনও এ দেশের নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা তাঁহাদের প্রাচীন নৃত্য-কলা-কৌশল একেবারে হারান নাই। কয়েক বৎসর হইল লাট সাহেবের অভ্যর্থনা উপলক্ষে ভারতের একজন মহারাজ তাঁহাকে নর্ত্তকীদের যে অদ্ভুত নর্ত্তন-কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে লাট সাহেব এবং তদীয় অনুচর সাহেবেরা চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সংবাদদাতা তদুপলক্ষে লিখিয়াছিলেন—নর্ত্তকীরা "danced on sword-edges; on sharp spikes and saws, and finally on frail hollow sugar wafers without breaking them in order to show their lightness of foot."

হারিলে তোমার সব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী॥
যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নাচেন রাই।
মুরলী লুকান শ্যাম চারি দিকে চাই॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে।
দুখিনী কহিছে গোপী-মণ্ডলী হাসালে॥

৫

শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে।
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল॥
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ॥
তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তম্বুরা রঙ্গদেবী।
ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী॥
উন্মট-তালেতে যদি হার বনমালী।
চূড়া-বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে থোব দুখিনী শুনে হাসি॥

মুরলী লুকান শ্যাম…চাই—কৃষ্ণ হারিয়া গিয়াছেন। পাছে তাঁহার সর্বস্ব-ধন বাঁশী হারাইতে হয় এই ভয়ে তিনি চারিদিকে চাহিয়া (কেহ দেখিতে পায় কি না—ভয়ে ভয়ে) বাঁশীটি লুকাইয়া ফেলিলেন।

দুখিনী—পদকর্ত্রীর নাম। কেহ কেহ মনে করেন, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শ্যামানন্দই নিজেকে দুখিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

৫। উন্মট— তালের নাম। গায়কেরা তাহার বোল আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা—ধেন্দা থেকা খেটা থোড় লাগ ঝিনি ঝাঁ ইত্যাদি। কপিনাস, পিনাক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বায়—বাজায়। থোব—রাখিব।

দশম স্তবক

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

১

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি, আরতি কহনে ন যাই।
হেম আঁচরে রহ ভরমিত যৈছন
খোজি ফিরত আন ঠাঞি॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
বিরহ-বেদনে রহ জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নহি ফুর।
প্রিয় সহচরী লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহ দুর॥

১। নাগর···বিরহ-হুতাশে—নিভৃত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে ভুজবন্ধনের মধ্যে পাইয়াও শ্রীরাধা দারুণ বিরহে কাতর হইয়া কানু কানু করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন।

হেম···আন ঠাঞি—স্বর্ণ খণ্ড আঁচলে বাঁধা রহিয়াছে সে কথা ভুলিয়া গিয়া যেন অন্যত্র খুঁজিয়া ফিরিতেছেন।

কথি লাগি—কি জন্য, কি কারণে।

বিরহ-বেদনে রহ জাগি—বিরহের অসহ যন্ত্রণাই রাধাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, অর্থাৎ চেতনা হারাইতে দেয় নাই, নহিলে শ্রীরাধার এতক্ষণে চৈতন্যলোপ হইত।

রহ দুর—পদকর্ত্তা সসম্ভ্রমে দূর ব্যবধান হইতে এই অনুপম লীলা প্রত্যক্ষ করিতে চান।

২

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ॥

৩

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥

২। যত……ধায় রে—আমার ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে তাহার বশীভূত। যতই তাহাকে আয়ত্ত করিতে চাই, ততই তাহা বিগ্ড়াইয়া যায়। অন্য পথে যাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণের পথে অর্থাৎ তিনি যেখানে আছেন সেই দিকে পদ দুইটি আপনা আপনি ধাবিত হয়। আন—অন্য
যার নাম নাহি লই—যাহার নাম লইব না বলিয়া মনে করি। পরসঙ্গ—(তাহারই) প্রসঙ্গ।
ধিক্……অনুভব—আমার ইন্দ্রিয়গণকে ধিক্, তাহারা আর আমাকে মানে না। সর্ব্বদা সেই কানু আমার অনুভবের বিষয় হইয়া আছে।
ভাল ভাবে……পুছ—(অর্থাৎ গোপনে রাখিও—অনুরাগের কথা, সাধনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই)। তুমি সুখেই আছ (অর্থাৎ এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ সর্ব্বথা শুভলক্ষণ)—তোমার মর্ম্মের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না।
৩। অলপ—অল্প।
কামনা করিয়া……রাধা—এই কামনা করিয়া সাগরে ডুবিয়া মরিব যে, পরজন্মে আমি যেন নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করি এবং তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেন রাধা হইয়া জন্মলাভ কর।—এইভাবে আমি আমার মনের সাধ মিটাইয়া লইব, অর্থাৎ এ জন্মে তুমি যেমন আমাকে বার বার কাঁদাইয়াছ, আমিও সেইরূপ পরজন্মে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে কাঁদাইব। এইভাবে প্রতিশোধ লইয়া আমি আমার মনের সাধ মিটাইয়া লইব।

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা॥

৪

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

সহজ—সরল।

৪। অবলার…হেন—তোমার ন্যায় রমণীর মন মোহিত করিতে পারে, এরূপ আর কেহ নাই।

ঘর কৈনু…পিরীতি—তোমাকে পাইবার জন্য আমি কি না করিয়াছি? আমার স্বভাব, সংস্কার, আচরণ, এমন কি প্রকৃতির বিধান পর্য্যন্ত, বিপর্য্যস্ত করিয়া অসাধ্যসাধন করিলাম, তথাপি তোমার প্রেমের স্বরূপ আজও বুঝিতে পারিলাম না।

কোন্ বিধি…শেঁওলি—শেওলা যেমন স্রোতে ভাসিয়া যায়, যে দিকে প্রবাহ সেই দিকে তাদের গতি; —অর্থাৎ নিতান্ত অসহায়। তোমার প্রেমের দারুণ স্রোতোবেগে আমি আমার ব্যক্তিত্বের তটভূমি হইতে স্খলিত হইয়া অসহায়ভাবে ভাসিয়া যাইতেছি।

সিরজিল—সৃষ্টি করিল।

ব্যথিত—সমবেদনশীল।

বঁধু…রও—একমাত্র তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করিতেছি, তুমি যদি আমার প্রতি নির্ম্মম হও, তবে দাঁড়াও,—তোমার সম্মুখেই এই প্রাণ ত্যাগ করিব।

৫

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ-মুখ
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥

৬

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥

৫। সুধায়—জিজ্ঞাসা করে। ভখিমু—খাইব।
এ ছার…মুখ—এই দুঃখপূর্ণ জীবনে আর কি সুখ আছে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখাই জীবনের একমাত্র আনন্দ ও সফলতা। একবার এই দুঃখিনীর সম্মুখে দাঁড়াও, আমি তোমার মুখখানি দেখিয়া মরি।
সোয়াস্তি—আরাম। নাহি টুটে ভুখ—আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ব্যথিত—সমদুঃখী।
ইহা না যুয়ায়—ইহা উচিত (যোগ্য) হয় না। নিলাজ—নির্লজ্জ।
পরের বোলে…চায়—লোকে নিন্দা ও গঞ্জনা করে বলিয়াই কি তুমি প্রাণ ত্যাগ করিবে? পরের কথায় কে কবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে?
৬। খলের—প্রতারকের।

তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছ গোঙারের হাতে।
কানাই খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে॥

৭

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিশি কাঁদি তবু হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি, কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হৈনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবই অধরসুধা উগারে গরল॥

তরলে জনম তোর—তরলা, তল্লা বা তল্তা বাঁশের বংশে তোর জন্ম। (ভিতর-ফোঁপরা এক জাতীয় পাত্‌লা সরু বাঁশকে তরলা, তল্লা বা তল্তা বাঁশ বলে। এই বাঁশ অত্যন্ত নরম এবং একটুতেই নুইয়া পড়ে।)

তরলে…হাতে—শ্রীরাধা বলিতেছেন,—তরলা বাঁশের বংশে তোর জন্ম। তুই ভিতর-ফোঁপরা, অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য। তোর নিজের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কিছুই নাই, তোকে যে কেহ অনায়াসে নোয়াইয়া ফেলিতে পারে, অর্থাৎ তোকে দিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লইতে পারে। সম্প্রতি তুই গোঙারের হাতে পড়িয়াছিস্, সুতরাং তুই যে তাহারই ইঙ্গিত মত চলিবি, ইহা ত খুবই স্বাভাবিক।

খুটিয়া—উপাধি-বিশেষ।

৭। তরল…বেড়াজাল—শ্রীরাধা বলিতেছেন,—হাল্কা, পাত্‌লা, ফাঁপা, তল্লা বাঁশের বংশে এই বাঁশীর জন্ম, সুতরাং উহাকে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আসলে কিন্তু ওটি একটি সাংঘাতিক বস্তু। বেড়াজাল যেমন মাছকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরিয়া ডাঙ্গার দিকে টানিয়া আনে, শ্যামের ঐ বাঁশীটি সেইরূপ রাতদিন 'রাধা রাধা' বলিয়া ডাকিয়া নামের বেড়াজাল বিস্তার করিয়া চারিদিক হইতে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পানে টানিয়া আনে।

সভার…কাল—সকলের পক্ষে এই বাঁশী নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু আমার পক্ষে ইহা দারুণ মারণাস্ত্র।

অন্তরে…গরল—বাহির হইতে দেখিয়া বাঁশীটিকে সরল বলিয়াই মনে হয়, অন্তরে কিন্তু ওটি একেবারেই সারহীন, অর্থাৎ গুণহীন, হৃদয়হীন। বাঁশীটি শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা সর্ব্বদা পান করিতেছে, সুতরাং তাহার কাছ হইতে সুধাই আশা করা যায়, কিন্তু এমনই তার অদ্ভুত প্রকৃতি যে, সুধা পান করিয়া বিষ উদ্গার করে, অর্থাৎ আমাকে মদন-বিষে জর্জ্জরিত করে।

যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

৮

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

লাগি পাও—যদি তাহার নাগাল পাই।
সাগরে ভাসাও—কি জানি নদীতে ভাসাইলে আবার যদি তট-লগ্ন হইয়া মূল বিস্তার করে।
৮। উচল—উচ্চ। অচল—পর্ব্বত। লছিমী—লক্ষ্মী, শ্রী। বেঢ়ল—ঘেরিয়া ধরিল।
পিয়াস—তৃষ্ণা। বজর—বজ্র। কহে চণ্ডীদাস—পাঠান্তর।

৯

আইস আইস বন্ধু আইস আধ আঁচরে বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি॥
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধ রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
যদি গুরুজন জিজ্ঞাসে বলিব
পর্যাছি কালা পাটের জাদ॥
নহে ত লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাজরে কাটিয়া সিন্ধ॥

১০

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥

৯। এই পদটি চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই পদটির সুন্দর আস্বাদন পাওয়া যাইবে। পাঠভেদ লক্ষণীয়।
জাদ—বেণীর সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা যে খোপা পরেন।
লেহের—নেহের, স্নেহের, প্রেমের। সিন্ধ—সিঁদ

আল সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনেতে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

১০। নিদান—রোগের মূল কারণ নির্ণয়: চিকিৎসকের চরম অভিমত।

আল সই···নিদান—শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমার এই প্রেমব্যাধির মূল কারণ কি তাহা আমি শুনিয়াছি অর্থাৎ জানিতে পারিয়াছি। কৃষ্ণ-বিরহ হইতেই এ রোগের উৎপত্তি, সুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না পারিলে এ ব্যাধির উপশম হইবে না, এবং এই ব্যাধিই আমার মৃত্যুর কারণ হইবে।

নহিল—না হইল।

একাদশ স্তবক

নিবেদন

১

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥

১। জীবনে মরণে…তুমি—শুধু মৃত্যুকালে নহে, জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমি তোমাকেই প্রাণপ্রিয় বলিয়া জানি। শুধু এই জন্মে নহে, যতবার আসিব-যাইব—যত জন্ম হইবে—তুমিই আমার একমাত্র প্রিয় থাকিও।

তোমার চরণে…প্রেমের ফাঁসি—তোমার পদযুগল এবং আমার প্রাণের সঙ্গে প্রেমের ফাঁসি লাগিয়াছে, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় তিলমাত্র সরাইয়া লইলে আমার প্রাণ যাইবে।

একুলে…কায়—পিতৃকুল ও স্বামীকুল এই দুই কুলে এবং সমগ্র গোকুলে, অর্থাৎ ত্রিসংসারে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই।

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

২

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥

অখল—সরল (খলতাশূন্য)।
পরশ…পরি—তুমি আমার স্পর্শ মণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোনা অর্থাৎ অমূল্য বস্তু হয়), তোমাকে হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয়। যেন এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে হৃদয় হইতে বিযুক্ত করিতে না হয়।
২। তোহারে—তোমাকে। আন—অন্য। ভায়—প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয়।
পাপ পুণ্য…চরণখানি—পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক তোমার পদযুগলই আমার সর্বস্ব।

৩

নবরে নবরে নব নবঘন শ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
তোমার পিরীতি-সুখ-সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার॥
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু, থাকি কি না থাকি।
অমূল্য ও রাঙ্গাচরণ জীয়ন্তে যেন দেখি॥
যদুনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু।
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু॥

৪

বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

৩। নবঘন শ্যাম—নব-জলধর তুল্য বর্ণ যাঁহার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ।
তুমি যে···তোমার—এখানে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমের কথা বলা হইয়াছে। 'তুমি আমার'—ইহা মদীয়তাময় প্রেমের স্বরূপ। 'আমি তোমার'—ইহা তদীয়তাময় বুদ্ধি-প্রসূত। উভয়ই প্রেমের উৎকর্ষ সূচনা করে।

৪। গরবে—গর্বে। অঞ্জন—কাজল।

৫

পূরুবে যতেক করিলুঁ সুতপ
তপের নাহিক সীমা।
সেই সব তপ বিফল নহিল
তেঞি সে পাইলুঁ তোমা॥
মৃগমদ বলি ঝাঁপিয়া কাঁচলি
রাখিব হিয়ার মাঝে।
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া
রাখিব লোকের লাজে॥
কিম্বা কেশপাশে কুবলয়-দামে
রাখিব যতন করি।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া
দেখিব নয়ান ভরি॥
যদি কদাচিত হয় জানাজানি
কহিব বেকত করি।
সে ভয়ে সভয় নহি কদাচিত
কহে দাস নরহরি॥

৬

জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইলু গোকুলপুরী
বরজ-মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ॥

৫। পূরুবে—পূর্ব্বে। ঝাঁপিয়া—আচ্ছাদিত করিয়া।
মুকুত করিয়া—মুক্ত করিয়া। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।

গঞ্জন-বচন তোর শুনি সুখের নাহি ওর
সুধাসম লাগয়ে মরমে।
তরল কমল-আঁখি তেরছ নয়ানে দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হৈল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥

৬। গঞ্জন-বচন—গঞ্জনা-বাক্য, তিরস্কার।
ওর—সীমা। তেরছ—বক্র, তেরচা।
তোমার পিরীতি···তনু—শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন, তোমার প্রেম ব্যতীত আর কোনও প্রেম আমাকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পৃথক্ করিতে পারে নাই। তুমি আমারই হ্লাদিনী শক্তি। নিজের আনন্দ-চেতনার আস্বাদনের জন্যই আমার অন্তর্নিহিত হ্লাদিনী শক্তিকে তোমার ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া নিজেকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ আমাকে দ্বৈত হইতে হইয়াছে।

দ্বাদশ স্তবক

মাথুর

১

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনি রাই।
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
সে কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গো
শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে মানিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল বিরহের ভয়॥

১। তুলিকায়—(নরম) তুলা দিয়া।

তোমরা···যাবে—তোমরা যে বল শ্যামচাঁদ আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমার এই হৃদয়-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যে চিরদিন বিরাজ করিতেছেন। সেই আমার অন্তরবাসী শ্রীকৃষ্ণকে আমার এই হৃদয়-মন্দির হইতে যতক্ষণ পর্যান্ত না নিজে মুক্তি দিতেছি, ততক্ষণ পর্যান্ত তাঁহার সাধ্য কি আমাকে ছাড়িয়া যান? শ্রীরাধা বলিতে চান—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দৈহিক বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁহার সহিত যে মধুর মিলন-লীলা অহরহঃ চলিতেছে, সে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কোথায়?

২

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজ-মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল
কালি কালিহ সাজ॥
সজনি, রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহ বনমালী॥
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনীনাথে।
নখতর চাঁদ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দীদেবী সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখই নিঅ তাতে।
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

২। নামহি···সাজ—শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—নামেই শুধু অক্রুর, আসলে কিন্তু যাহার মত ক্রুর আর দুটি নাই, সেই ব্যক্তি আজ বৃন্দাবনে আসিয়াছে, এবং 'কালই, ঠিক কালই (মথুরায় যাইবার জন্য) সাজিয়া-গুজিয়া প্রস্তুত হও'—এই শ্রবণকটু অশুভ বাক্য ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে।

সজনি···বনমালী—সখি, রজনী প্রভাত হইলেই (অক্রুর-ঘোষিত) সেই কাল আসিয়া দেখা দিবে, অতএব এমন একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির কর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে থাকেন।

যোগিনী-চরণ···পরভাতে—যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবীর চরণে শরণ লইয়া সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে দিয়া চন্দ্রকে আটক কর। নক্ষত্র এবং চন্দ্র যেন গগনে প্রকাশিত থাকে।—প্রভাত যাহাতে না হয়।

কালিন্দী···অনুমাতে—যোগমায়া দ্বারা যদি এ কাজ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যমুনা দেবীকে সেবার দ্বারা তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে (ভাখহ) বল, তিনি যেন তাঁর পিতা সূর্যদেবকে আটকাইয়া রাখেন, অর্থাৎ তিনি যেন এমন ব্যবস্থা করেন যাহাতে তাঁহার পিতা সূর্যদেব পূর্ব গগনে উদিত হইয়া প্রভাতের সূচনা করিতে না পারেন। আর যমুনা দেবী যদি এ ভার লইতে রাজি না হন, তাহা হইলে তিনি যেন অবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা যমরাজকে আনিয়া উপস্থিত করেন, অর্থাৎ আমার যেন অবিলম্বে মৃত্যু ঘটে। শ্রীরাধার মনের ভাব ঠিক এইরূপই হইয়াছিল বলিয়া পদকর্তা গোবিন্দদাস অনুমান করেন।

৩

কিয়ে সখি চম্পক- দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম শ্রীদাম আর হলধর
এসব সহচর সাথ।
শুনইতে মূরছি পড়ল সোই কামিনী
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥

৪

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিন শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥

৩। চম্পক-দাম—চম্পক মালা, চাঁপার মালা। বনায়সি—বানাইতেছ, মাল্য রচনা করিতেছ। রভস-বিহার—সম্ভোগ-বিহার। কুলিশ—বজ্র।
৪। অব—এখন। কো—কে। শূন—শূন্য। নগরী—দেশ। সগরি—সকলি। কৈছনে—কেমন করিয়া। নেহারব—দেখিব।

12—2287 B.T.

সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান॥

৫

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কু-দিন দিবস দুই-চারি॥

৬

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা॥

সঞে—সহিত। যাঁহা—যেখানে। কয়ল—করিল।
ফুল-খেরি—ফুল-খেলা। 'ফুলবারি' পাঠান্তর; অর্থ—ফুলবাগান।
জীয়ব—জীবন ধারণ করিব। তাহি—তাহা।
বিদ্যাপতি…কান—বিদ্যাপতি সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, তুমি দুঃখ করিও না, তিনি চিরতরে চলিয়া যান নাই, কৌতুক দেখিবার জন্য তিনি তথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন।
ছাপি—লুকাইয়া। তঁহি—সেখানে। রহু—রহিয়াছেন।
৫। গেও—গিয়াছে। বিপথে…মালতীমালা—যেন মালতী ফুলের মালা বিপথে কেহ ফেলিয়া দিয়াছে।
পড়ল—পড়িল। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৈছনে—কেমন করিয়া।
নয়নক—নয়নের। নিন্দ—নিদ্রা। বয়নক—বয়ানের, মুখের।
সুখ…পিয়া-সঙ্গ—প্রিয়ের সঙ্গে সুখ গিয়াছে। বরনারী—সুন্দরী রমণী। সুজনক—সুজনের।
সুজনক…চারি—সজ্জন ব্যক্তির অশুভ সময় (কু-দিন) মাত্র দুই-চার দিনের জন্য।
৬। চির চন্দন…ভেলা—যাঁহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকুও বাধা হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন বা হার পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্ব্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন।

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ-ভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরাঃ।"

মহানাটকের এই শ্লোকটির ভাব এই পদে সুস্পষ্ট।
চির—চীর, বসন। উরে—বক্ষে। না দেলা—দিই নাই। আঁতর—অন্তর, ব্যবধান। কাহুক—কাহাকেও।
না গণলা—গণনা করি নাই। মোহে—আমাকে। কে কি না কহলা—কেই বা কি না বলিয়াছে।

বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

৭

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

বিছুরল—বিস্মৃত হইল, যদি আমায় ভুলিয়া গেল।
পুরব জনমে…ভরমে—পূর্ব্বজন্মে ভুলক্রমে (ভরমে) বিধাতা আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই হইল।
পিয়াক দোখ…করমে—আমার প্রিয়ের কোনও দোষ নাই; যাহা আমার কর্ম্মে ছিল, তাহাই ফলিতেছে।
আন—অন্য। পাঁজর—বক্ষঃপঞ্জর। ঝাঁঝর—ছিদ্রময়।
৭। ওর—সীমা। ভরা—পূর্ণ। বাদর—বাদল,বর্ষা। মাহ—মাস।
ভাদর—ভাদ্র। এই ভাদ্রমাসে ভরা বাদল, কিন্তু আমার গৃহ শূন্য।
ঝম্পি—ঝাঁপিয়া, দশ দিক্ ব্যাপিয়া। ঘন—মেঘ। গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে।
সন্ততি—সতত। বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে। পাহুন—প্রবাসী।
কাম…হন্তিয়া—নিষ্ঠুর (দারুণ) কামদেব সঘনে তীক্ষ্ণ শর হানিতেছে।
কুলিশ…মাতিয়া—শত শত কুলিশপাত (বজ্রপাত) দ্বারা আনন্দিত (মোদিত) ময়ূর মত্ত হইয়া নাচিতেছে।
দাদুরী—ভেক।
ফাটি…ছাতিয়া—আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কারণ আমার প্রিয় নিকটে নাই।

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

৮

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহিল॥
মরম-ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

৯

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা॥
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া—বিদ্যুতের সমূহ (পঙ্‌ক্তি) অস্থির (অথির) হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।
গোঙায়বি—যাপন করিবি। রাতিয়া—রাত্রি।
৮। বুলে—ভ্রমণ করে। অবহুঁ—এখনও। নিচয়ে—নিশ্চয়।
রসিয়া—রসিক। নিলজ—নির্লজ্জ।
৯। প্রেমক অঙ্কুর…পলাশা—প্রেমের অঙ্কুর জাত-মাত্রেই অর্থাৎ জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আতপ (আত) অর্থাৎ রৌদ্র দেখা দিল।—দুটি কচি পল্লবও মেলিবার সুযোগ পাইল না।
সুখ-লব—সুখ-কণা, কণামাত্র সুখ।
অবধি—মিলনের প্রতিশ্রুত সময়ের সীমা। বিছুরাই—ভুলিয়া।

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পুর॥

১০

অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

অনুভবি···বিহি-নিরমাণ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অনুভব করিয়া, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের অস্বাভাবিক গতি লক্ষ্য করিয়া অনুমান হইতেছে, বিধাতার নির্মাণ অর্থাৎ বিধাতার বিধান সব উলোট-পালোট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটিতেছে। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেমদানে বঞ্চিত করিবে ইহা ত সৃষ্টির নিয়ম নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার প্রেমিকা শ্রীরাধার নিকট নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া এবং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে।

১০। জারব—পুড়িবে।

বারিদ মেহে—জলবাহী মেঘে। অঙ্কুর হইতেই যদি রবি-তাপে পুড়িয়া গেল, তাহা হইলে (পরে) জলপূর্ণ মেঘে আর কি করিবে? মেহে—মেঘে।

পিয়া-লেহে—বন্ধুর স্নেহে। তাঁহার ভালবাসায় তখন আর কি লাভ হইবে?

ইহ—এখানে।

দৈব-দুরাশা—কোন্ দুর্দৈব এই ক্ষেত্রে (এমন) দুঃখ ঘটাইল। দুরাশা—নৈরাশ্য।

পিয়াসা—পিপাসা। ছোড়ব—ছাড়িবে। বরিখব—বর্ষণ করিবে। আগি—অগ্নি।

চিন্তামণি—একপ্রকার মণি,—যাহার গুণে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই সুলভ হয়। আমার ভাগ্য-দোষে চিন্তামণিও নিজ গুণ ত্যাগ করিল, ইহা অপেক্ষা কর্মফলজনিত অভাগ্য আর কি আছে?

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
 সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
 বিদ্যাপতি রহ ধন্দে॥

১১

যো মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নিলজ প্রাণ সহজে রহ মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক জীবইতে লাজ রহ মোর॥
জনু বড়বানল হৃদি-মাহা এহ।
কিয়ে সুখ-লাগি ভসম নহ দেহ॥

মাহ—মাস। ঘন—মেঘ। সুরতরু—কল্পতরু।
বাঁঝকি ছন্দে—বন্ধ্যার মত (ছন্দে)। বাঁঝকি—বাঁঝার, বন্ধ্যার।
গিরিধর—যিনি গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া সমস্ত গোকুলকে ইন্দ্রের ক্রোধ হইতে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজন-শরণ্য শ্রীকৃষ্ণ।
ঠাম—ঠাঁই, স্থান। পাওব—পাইব।
ধন্দে—ধাঁধায়। বিদ্যাপতি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, তাঁহার নিকট এটি একটি ধাঁধা (রহস্য)।
 সমুদ্রের নিকটে যাইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ফিরিয়া আসা (জলনিধির নিকট জল না পাওয়া) চন্দন-বৃক্ষের নিকটে যাইয়া সুগন্ধ না পাওয়া, চন্দ্রকিরণে অগ্নির উত্তাপ লাভ করা, শ্রাবণ মাসে মেঘের নিকট এক বিন্দু জল না পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া এবং কল্পতরুর বন্ধ্যাত্ব,—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া ফল না পাওয়ার মতই। বিদ্যাপতি এই রহস্য ভেদ না করিতে পারিয়া গোলে পড়িয়াছেন।
১১। পরবোধসি—প্রবোধ দিতেছ।
যো মুখ…কহই—যে (শ্রীকৃষ্ণের) মুখ দেখিবার জন্য নিমেষের বাধা সহ্য হয় না, (সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ) আসিবেন বলিয়া তোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ।
নিলজ…মোয়—(নিতান্ত) নির্লজ্জ বলিয়াই আমার এ প্রাণ সহজে অর্থাৎ অনায়াসে রহিয়া গেল—(প্রিয়তমের বিরহে দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল না)।
বড়বানল—সমুদ্র-মধ্যস্থ অগ্নি। জনু—যেন।
জনু…দেহ—সমুদ্র-বক্ষে, যেমন বড়বানল জ্বলিতে থাকে, আমার হৃদয়ের মধ্যে সেইরূপ কৃষ্ণবিরহ-রূপ বড়বানল জ্বলিতেছে। কি সুখের আশায় যে এ দেহ (সেই বিরহানলে) দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয়॥

১২

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
রোপিনু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার॥
এই তরুশাখায় রহিল শারিশুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহব শেখর বচন নাহি ফূর॥

উপেখন—উপেক্ষণীয়।

১২। এই পদটি রাধার দশমী-দশার অর্থাৎ মৃত্যু-অবস্থার। কৃষ্ণের জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। মুমূর্ষু রাধা বলিতেছেন, আমার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণ যেন এই বৃন্দাবনে এক বার আইসেন, এই অনুরোধ তাঁহাকে জানাইও।

মল্লিকা ফুলের চারা পুঁতিয়াছিলাম, তাঁহাকে সেই ফুলের মালা পরাইব বলিয়া। আমার ভাগ্যে তাহা হইল না, যখন এই গাছে ফুল ধরিবে, তখন আমি আর এ জগতে থাকিব না—তোমরা ফুলের মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাইও।

এই…ইহার মুখে—ইহাদের মুখে যেন তিনি আমার এই দশার কথা শুনেন।

কি কহব…ফূর—পদকর্ত্তা শেখর বলিতেছেন, তিনি আর কি কহিবেন, তাঁহার বাক্য স্ফুরণ হইতেছে না।

১৩

যাঁহা পহু অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ ॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

১৩। যাঁহা পহুঁ···ঠাম—বিরহ এবং মৃত্যু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কাম্য তাহা লইয়া শ্রীরাধার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। অবশেষে শ্রীরাধা মৃত্যুকেই কাম্য বলিয়া স্থির করিলেন।—ভাবিলেন, বিরহ এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-সমস্যার এইখানেই সমাধান হইল। পরক্ষণেই কিন্তু শ্রীরাধার মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পর পঞ্চ-ভূতে গড়া তাঁহার এই নশ্বর দেহ ত পঞ্চ-ভূতে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। যদি দেহই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখ কি দিয়া তিনি উপভোগ করিবেন? এই ভাবে শ্রীরাধার দোলায়মান চিত্তে বিরহ এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্ব আবার নূতন করিয়া দেখা দিল, অর্থাৎ তাঁহার মনে আবার নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগিল, তাঁহার নিকট বিরহ এবং মৃত্যু কোন্‌টি কাম্য। শ্রীরাধা কিন্তু শেষ পর্যান্ত এ দ্বন্দ্বেরও সমাধান করিলেন।—তিনি মনে মনে কামনা করিলেন, তাঁহার দেহের যে অংশ (ক্ষিতি) মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে, তাহা যেন সেই স্থানের মৃত্তিকায় পরিণত হয়, যে স্থান দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন গমনাগমন করেন; তাঁহার দেহের তেজ-অংশে শ্রীকৃষ্ণ যে দর্পণে মুখ দেখেন, তাহারই জ্যোতি (তেজ) হইয়া যেন বিরাজ করে; তাঁহার দেহের সলিলাংশে, শ্রীকৃষ্ণ যে সরোবরে স্নান করেন, তাহারই সলিলে (অপ্‌) যেন পরিণত হয়। তাঁহার দেহের বায়ু-অংশে শ্রীকৃষ্ণ যে পাখাটি ব্যবহার করেন, তাহারই যেন মৃদু বাতাস (মরুৎ) হইয়া দেখা দেয়। তাঁহার দেহের আকাশাংশে, যে আকাশে শ্যাম-জলধর বিচরণ করেন, সেই শ্যাম-জলধরের বিহার-ক্ষেত্র আকাশ (ব্যোম) হইয়া যেন বিরাজ করে। বিরহ এবং মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব শ্রীরাধার দোলায়মান চিত্তকে এতক্ষণ বিক্ষুব্ধ করিতেছিল, সে দ্বন্দ্বের এতক্ষণে অবসান হইল। শ্রীরাধা এখন নিশ্চিন্ত মনে বলিতেছেন—সখি, মৃত্যুর ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পথ যখন এতদিকে খোলা রহিয়াছে, তখন বিরহ এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন্‌টিকে বাছিয়া লইব, তাহা লইয়া ত কোন প্রশ্নই উঠে না, অর্থাৎ বিরহ এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ত এখানেই মিটিয়া গেল।

১৪

দৈর্য্যং রহু দৈর্য্যং রাই গচ্ছং-মথুরাওয়ে।
　　ঢুঁডব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
　　যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
　　অবিলম্বনে মথুরপুর আওল ব্রজরমণা ॥
মথুরাবাসিনী এক রমণী
　　তাকর দূতী পুছে।
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণখ্যাত
　　কাহার ভবনে আছে ॥
শুনি তার বাণী কহয়ে সো ধনি
　　সো কাহে ইহ আওব।
দেবকীসুত কৃষ্ণখ্যাত কংসঘাতী মাধব ॥
সোই সোই কোই কোই
　　(তাকি) দরশনে মোর আশা।
যদুনন্দন দাসে কহে ঐ যে উচ্চ বাসা ॥

১৪। প্রতক্ষে—প্রত্যক্ষভাবে।

দৈর্য্যং রহু……প্রতক্ষে—বিরহকাতরা শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছে—রাই, ধৈর্য্য ধর, আমি (শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য) মথুরায় যাইতেছি। সেখানে গিয়া আমি প্রত্যেক পুরে নিজে গিয়া প্রত্যক্ষভাবে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিব।

ভদ্রং…গমনা—উত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন—তোমার যাত্রা শুভ হৌক, অবিলম্বে তুমি বাহির হইয়া পড়।

অবিলম্বনে…আছে—অতঃপর সেই ব্রজরমণী অর্থাৎ রাধার সেই দূতীটি অবিলম্বে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে এক মথুরাবাসিনী রমণীর সহিত তাহার পথে দেখা। দূতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ গা, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ বলিয়া খ্যাত মানুষটি কাহার বাড়ীতে আছে বলিতে পার?

শুনি…মাধব—তাহার কথা শুনিয়া সেই মথুরাবাসিনীটি বলিল—সে এখানে আসিতে যাইবে কেন? এখানে কৃষ্ণ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি আছেন বটে, কিন্তু তিনি ত নন্দ-নন্দন নন, তিনি দেবকী-নন্দন। তাঁহার আর একটি নাম কংসঘাতী মাধব।

সোই সোই…বাসা—উল্লসিত হইয়া দূতী বলিয়া উঠিল—হাঁ, হাঁ, সেই বটে, সেই বটে, কোথায় গেলে তাঁহাকে পাইব বলিতে পার?—তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই ত আমার এতটা পথ আসা। দূতীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া পদকর্ত্তা বলিতেছেন—"ঐ যে উচ্চ প্রাসাদ দেখিতেছ, ঐখানে তাঁহার দেখা পাইবে।

১৫

মাধব, দুবরী পেখলু তাই।
চৌদশী-চাঁদ জনু অনুখণ খীয়ত
ঐছন জীবয়ে রাই॥
নিয়ড়ে সখীগণ বচন যো পুছত
উতর না দেয়ই রাধা।
হা হরি হা হরি করতহি অনুখণ
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥
সরসহি মলয়জ- পঙ্কহি পঙ্কজ
পরশে মানয়ে জনু আগি।
কসতে ধরণী- শয়নে তনু চমকিত
হৃদি-মাহা মনমথ জাগি॥
মন্দ মলয়ানিল বিষ সম মানই
মুরছই পিককুল-রাবে।
মালতী-মাল- পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি ইহ কহ ভাবে।

১৬

রাইয়ের দশা সখীর মুখে
শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল বুধি॥

১৫। দুবরী—দুর্ব্বলা। তাই—তাহাকে। চৌদশী-চাঁদ—চতুর্দ্দশীর চাঁদ।
খীয়ত—ক্ষীণ হয়। নিয়ড়ে—নিকটে। মলয়জ—মলয়-পর্ব্বত-জাত চন্দন।
মলয়জ-পঙ্ক—চন্দন-পঙ্ক। কর্দ্দমবৎ ঘষা চন্দন। আগি—অগ্নি।
সরসহি...আগি—সরস চন্দন-পঙ্ক এবং পঙ্কজ তাহার নিকট (অগ্নির মত) জ্বালাদায়ক মনে হয়।
ভূপতি ইহ কহ ভাবে—পদকর্ত্তা ভূপতি রাধার এই ভাবের অর্থাৎ অবস্থার কথা কহিতেছে।
১৬। বুধি—বুদ্ধি।

অনেক যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ-গমন ইছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠাইল কহিয়া সার॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আনমত না ভাব চিতে॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড় চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥

———

বরজ-গমন—বৃন্দাবনে গমন। ইছিল—ইচ্ছা করিলেন। আনমত—অন্যথা, অন্যপ্রকার।

ত্রয়োদশ স্তবক

ভাবোল্লাস ও মিলন

১

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।

মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল॥

১। সই…ভেল—সখি, বোধ হয় কুদিন সুদিনে পরিণত হইল।
ভেল—হইল। মন্দিরে তুরিতে আওব—গৃহে শীঘ্র আসিবেন।
কপাল কহিয়া গেল—আমার অদৃষ্ট যেন আমাকে বলিয়া গেল। 'কপালি' পাঠান্তর—কপালগণক।
চিকুর ফুরিছে—আনন্দে চুলগুলি স্ফুরিত হইতেছে।
পুলক…ভার—যৌবন বোঝার মত পীড়া দিতেছে না, বরঞ্চ যৌবনের ভার আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে।
প্রভাত…বসিল তায়—কাক ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিদিত। কাকচরিত্র পাঠ করিলে জানা যায়, কাকের বিচিত্র প্রকার ডাকে শুভ বা অশুভ সূচিত হয়। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমনবার্ত্তা শুনিবার জন্য রাধা ব্যাকুল হইয়া কত প্রশ্ন করেন—তাহাদিগকে খাবার জিনিষ দিয়া সুসংবাদ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু কাকেরা খাবার খাইয়া চলিয়া যায়—তাঁহার কথার উত্তরে কোন শুভ ইঙ্গিত দেয় না। কিন্তু আজ তাহারা তাঁহার আহ্বানে প্রফুল্লচিত্তে নিকটে উড়িয়া আসিয়া বসিল।
মুখের তাম্বুল…ফুল—আনন্দের চিহ্নস্বরূপ চর্বিত পান আপনা আপনি খসিয়া পড়িতেছে এবং দেবতার মাথা হইতে আশীর্ব্বাদী ফুল পড়িতেছে।
বিহি…অনুকূল—বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন।

২

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গনে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার॥
কদলী-রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

৩

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥

২। ভাবোল্লাসের পদ।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন-প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল-আচারের স্থান,—সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নিজের কেশ দিয়াই সে বেদীতে ঝাঁট দেওয়া হইবে। আলিপনার দরকার নাই, শুভ্র মোতির হারই আলিপনা হইবে। "The human body is the highest temple of God" এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দৃষ্ট হইবে। রসের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পদে, বহুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায়, নায়িকার অপূর্ব্ব ভাবোল্লাস বা মিলনানন্দের কল্পনা সূচিত হইয়াছে।

সুঝম্প—আন্দোলিত।

দিশি দিশি…ঠাট—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বহু রমণীর উপস্থিতি আবশ্যক। আমি এরূপ বিচিত্র বিলাস-কলা বিস্তার করিব যে, মনে হইবে বহু রমণীর সমাবেশ হইয়াছে।

চৌদিগে…হাট—এমন রূপ বিস্তার করিব যে, মনে হইবে যেন চারিদিকে চাঁদের হাট মিলিয়াছে।

৩। এতেক…হ'লে—আমি অবলা, এ জন্য এই কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কিন্তু পাষাণ হইলেও এত দুঃখে ফাটিয়া যাইত।

এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে ॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে ॥

৪

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥

তোমার কুশলে কুশল মানি—আমার নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করি না, যদি তুমি কুশলে থাকিয়া থাক।
কোরে—ক্রোড়ে, বক্ষে।
(এখন) কোকিল···চন্দ—কোকিলের গান, অলিকুলের গুঞ্জন, মলয়ানিলহিল্লোল এবং চন্দ্রের কিরণ বিরহিনীর পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধি আছে। তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন, এখন তুমি আমার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছ, এখন আমি মলয়ানিল প্রভৃতিকে আর ভয় করি না।
৪। ভাগে—বহু ভাগ্যে। পেখলুঁ—দেখিলাম।
পিয়া-মুখ-চন্দা—প্রিয়ের মুখচন্দ্র। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন। মঝু—আমার।
আজু মঝু···দেহা—আজ আমার গৃহ গৃহ বলিয়া মানিলাম; আজ আমার দেহ দেহ বলিয়া মনে হইতেছে।
টুটল—দূর হইল। সবহুঁ—সকল।
সোই···মন্দা—সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, এখন লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, (কামদেবের) পঞ্চ শর এখন লক্ষ শর হউক এবং মলয় পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হউক। পূর্ব্বে কৃষ্ণকে না দেখিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সুখরাশি আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল। (পূর্ব্বপদের সহিত তুলনীয়।)

অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

৫

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি॥

ধনি…লেহা—তোমার নবীন প্রেম ধন্যাতিধন্য।

৫। চিরদিনে…মন্দিরে মোর—বহুকাল পরে মাধব আমার গৃহে আসিয়াছেন। চিরদিনে—দীর্ঘ দিনের পরে।

আঁচর ভরিয়া…পাঠাই—অর্থের জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্রবাসে পাঠাইতে বাধ্য হয়; কিন্তু আমি যদি আঁচল ভরিয়া মহামূল্য রত্ন পাই, তাহা হইলেও প্রিয়কে আর দূরে পাঠাইব না।

ওঢ়নী—গাত্রাবরণ, ওড়না। গীরিষির—গ্রীষ্মের। দরিয়া—নদী। না—নৌকা।

চতুর্দ্দশ স্তবক

প্রার্থনা

১

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

১। দেই—দিয়া।

দেই তুলসী···সমর্পিলুঁ—তিল-তুলসী দ্বারা কোন জিনিষ দান করিলে তাহা আর ফিরাইয়া লইবার উপায় থাকে না,—আমার এই দেহ তোমাকে তিল-তুলসী দিয়া সমর্পণ করিতেছি; অর্থাৎ এই দেহের উপর আমার দাবী একেবারে ত্যাগ করিলাম। তুমি ইহাকে যে ভাবে চালাইবে, ইহা সেই ভাবেই চলিবে। তোমারই মন্দিরের পথে আমার পা চলিবে, তোমার দিকে আমার চক্ষু চাহিয়া থাকিবে, তোমারই নাম আমার জিহ্বা জপ করিবে—ইত্যাদি।

জনু, জনি—যেন না।

গণইতে···বিচার—যখন তুমি আমার দোষ-গুণের বিচার করিবে, তখন দোষ গণিতে যাইয়া—গুণলেশ আমার মধ্যে পাইবে না।

তুহুঁ জগন্নাথ···কহায়সি—তুমি জগতের নাথ বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। আমার কেবল ভরসা এই যে, লোকে তোমাকে জগতের নাথ বলে; আমি অতি অপরাধী হইলেও, যখন তোমারই জগতে বাস করিতেছি, তখন একদিন না একদিন আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

কিয়ে—কিবা। করম—কর্ম্ম। তুয়া পরসঙ্গ—তোমার প্রসঙ্গ।

কিয়ে মানুষ···পরসঙ্গ—কর্ম্মফলবশতঃ কি মনুষ্য, কি পশু অথবা কীট-পতঙ্গ যেরূপ জন্মই না কেন আমি গ্রহণ করি—সকল জন্মেই যেন তোমার প্রসঙ্গে আমার মতি থাকে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

২

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলু
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা ॥

তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে। ইহ—এই।
পদপল্লব—'পদপলব' (প্লব—ভেলা) অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।
তিল এক—এক তিলের অর্থাৎ কিয়ৎক্ষণের জন্য।
২। তাতল—উত্তপ্ত। সৈকত—বালু। সুত-মিত-রমণী-সমাজে—পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী।
তাতল…কাজে—উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পতিত জলবিন্দুর মত পুত্র-মিত্র-রমণী প্রভৃতি অর্থাৎ পুত্র-মিত্র-ভার্য্যাদি-পরিবৃত এই সংসার ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী, শাশ্বত তোমাকে ভুলিয়া এহেন ক্ষণস্থায়ী সংসারে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন আমি কোন্ কাজে লাগিব? অর্থাৎ আমার এ জীবনের মূল্য কি? অর্থাৎ আমার এ জীবন ব্যর্থ হইল।
তোহে—তোমাকে। বিসরি'—বিস্মৃত হইয়া। তাহে—তাহাদিগকে।
তুহুঁ…বিশোয়াসা—তুমি জগৎ-ত্রাতা, দীনের প্রতি দয়াশীল, এই জন্যই তোমার উপর বিশ্বাস (বিশোয়াসা) রাখিতেছি—যেহেতু আমি জগতের একজন ও অতি দীন। "জগ বাহির নহ মুঞি ছার"—তুলনীয়।
আধ জনম—অর্দ্ধজন্ম। নিন্দে—নিদ্রায়। জরা—বার্দ্ধক্য।
আধ জনম…গেলা—জীবনের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। তার পরে শৈশব এবং বার্দ্ধক্যেও অনেক সময় কাটিল।

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা॥

৩

কপট চাতুরী চিতে জন-মন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নামখানি।
দাঁড়াইয়া সত্য-পথে অসত্য যজিয়ে তাথে
পরিণামে কি হবে না জানি॥
ওহে নাথ, মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য না মানিলু মুক্তি ধিক্
অতয়ে সে না দেখি উদ্ধার॥
লোকে করে সত্য-বুদ্ধি মোর নাহি নিজ-শুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেমভাব মোরে করে নিজ-গুণে তারা তরে
আপনি হইলুঁ ছোঁচ হাঁড়ি॥

চতুরানন—ব্রহ্মা, এক এক ব্রহ্মার পরমায়ু যুগ-যুগব্যাপী, এরূপ বহু ব্রহ্মা মরিয়া যাইতেছেন।
তুয়া—তোমার। সমাওত—প্রবেশ করে, লীন হইয়া যায়।
আদি…তোহারা—তুমি আদি ও অনাদির নাথ বলিয়া লোকে ঘোষণা করিতেছে—এখন (অব) তারণের (ত্রাণ করিবার) ভার তোমার (তোহারা)। পাঠান্তর—ভবতারণ-ভার।
৩। যজিয়ে—যাজন করি, অর্থাৎ পূজা করি।
দাঁড়াইয়া…তাথে—শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত সত্যপথে দাঁড়াইয়া অসত্যের পূজা করি, অর্থাৎ কপটতাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাহারই সেবা করিতেছি। অতয়ে—অতএব।
লোকে….ভাঁড়ি—আমার নিজের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, লোকে কিন্তু মনে করে আমি সত্য-বুদ্ধি লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ সত্য-পথের সন্ধান পাইয়াছি। উদারতার ভাণ করিয়া আমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিতেছি।
প্রেমভাব……হাঁড়ি—আমার অন্তরে আজিও প্রেমভাবের উন্মেষ হয় নাই, কিন্তু লোকে আমার অন্তরে প্রকৃত প্রেমভাব জাগিয়াছে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসে এবং তাহাদের সরল বিশ্বাসের ফলে আমার সংস্পর্শে আসিয়া তরিয়া যায়, আমি নিজে কিন্তু সংসারের এই আস্তাকুঁড়ে বিষয়-বাসনার আবর্জনারাশির মধ্যে উচ্ছিষ্ট ভাঙ্গা হাঁড়ির মত অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়া থাকি।

চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পরিষদসঙ্গে সংকীর্তন-রস-রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব॥

৪

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহু-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পুরি
যোগাইব অধর-যুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনে অন্ত নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোক-নাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

৫

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব॥

৪। সেবন—সেবা। সম্পুট—কৌটা, ডিবা।
ভায়—দীপ্তি পায়। ভাল লাগে। শরণ—আশ্রয়।
৫। দশা—অবস্থা। প্রকৃতি—নারী।

টানিয়া বান্ধিব চুড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া॥
হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥

গুঞ্জা—কুচ।
তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া—তাহাতে গুঞ্জা মালার বেষ্টনী দিব অর্থাৎ গুঞ্জার মালা দিয়া চূড়াটি বেড়িয়া দিব। নরোত্তম সখী-ভাবে ভজনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।